চিরকুমার

– এস.এম আছাব আলী

এই গল্পের শুরু ১৯৬০ সালে।

আমি তখন উত্তর বাংলায় তিলকপুর হাই স্কুলে ক্লাস টেনের ছাত্র। একদিন পিয়ন আমাকে ভাবীর একটি চিঠি দিল।

স্কুলের পাশেই পোস্ট অফিস। আমাদের গ্রামে কারো নামে কোনো চিঠি এলে পিয়ন তা আমাকেই দিতো। এর আগেও ভাবীর আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে কয়টা চিঠি এসেছে। এই চিঠিও শার্টের বুক পকেটে রেখে বাড়ি ফিরছিলাম। কিন্তু অনুভব করলাম চিঠির ভেতর থেকে সেন্টের সুগন্ধ বের হচ্ছে। এই সুগন্ধ আমার তরুণ মনকে কৌতূহলে ভরিয়ে দিল। বাড়ির কাছাকাছি মাঠের মাঝামাঝি এক নির্জন স্থানে বসে খামের মুখ খুলে চিঠি বের করে হতবাক হয়ে গেলাম। একটি লম্বা প্রেমপত্র। অত্যন্ত সুন্দর, সুস্পষ্ট কালো কালি দিয়ে লেখা এই চিঠির উপরিভাগে লাল কালি দিয়ে আকা দুটি বড় বড় চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুর ফোটা। সেই চিঠি দেখে এবং পড়ে রাগ, দুঃখ, বেদনা, ঘৃণায় আমার অন্তরাত্মা হুহু করে কেদে উঠলো।

আমরা ছিলাম একটি গরিব কৃষক পরিবার। আমার বড় ভাই বিএ পাস করে খাদ্য বিভাগে চাকরি নিয়ে কুড়িগ্রাম ছিলেন। তারই এক সহকর্মী বন্ধুর একমাত্র ছোট বোনকে বিয়ে করেছেন কিছুদিন আগে। প্রায় আমার সমবয়সী ভাবী আমাদের বাড়িতেই থাকেন। আমরা ভাইকে যেমন ভালোবাসি, ভাবীকেও তেমনি ভালোবাসি। সেই ভাবীর কাছে এই চিঠি? ছিঃ!

চিঠিটি লুকিয়ে রাখলাম। ভাবীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলাম।

আমার সঙ্গে কথা বলার অহরহ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ভাবী খুব কষ্টে ছটফট করতে লাগলেন। বার বার প্রশ্ন করতে লাগলেন, খোকা, তোমার কি হয়েছে, বলো?

খোকা ছিল আমার ডাক নাম। আমি সেই চিঠির কথা ভাবীকে কিছুতেই বলতে পারছিলাম না।

পৃথিবীতে কখনো কখনো কিছু অর্থহীন ঘটনা ঘটে যেগুলোর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা চলে না, শুধু মনকে শক্ত করে মেনে নিতে হয়। রাগ কমতে কয়দিন কেটে গেল। এছাড়া ভাবীর অশ্রুসিক্ত চোখে, ঈষৎ পুরু ঠোটে, বাকা সরু ভ্রূতে, দীর্ঘ ক্ষীণদেহে আর উজ্জ্বল শ্যাম রঙে কেমন একটা মায়াবী আকর্ষণ।

একদিন ভাবীকে আড়ালে ডেকে বললাম, নূর মোহাম্মদ চৌধুরীর চিঠি এসেছে। চিঠিটা ভাবীর দিকে এগিয়ে দিলাম।

ভাবী হাত বাড়ালেন না, চিঠি নিলেন না। তার চোখে মুখে লজ্জা ও আতংকের কালিমা ছড়িয়ে পড়লো। তবু খুব শান্ত কণ্ঠে আমাকে বললেন, ইনি আমার ভাবীর একমাত্র বড় ভাই। বগুড়া কলেজে পড়েন। গত তিন বছরে আমাকে নয়টি চিঠি দিয়েছেন। আমি কোনোদিন তাকে কোনো চিঠি লিখিনি। একদিন ভাবীকে সব খুলে বললাম এবং চিঠিগুলো দিলাম। ভাবী আবার মতি ভাইকে বললেন। ভাবীসহ মতিভাই নিজে তার শ্বশুরের কাছে বসেন এবং বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি আমাকে অন্যত্র বিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। তোমার ভাই, আমার ভাই একত্রে চাকরি করেন। তারা পরস্পর

বন্ধু। সব কিছু জেনেশুনেই তিনি আমাকে বিয়ে করেছেন। চিঠিটি তুমি রেখে দাও, তোমার ভাইয়া এলে তাকে দেখাবো।

আচলে মুখ ঢেকে ভাবী আমার সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন এবং সত্যি বলতে কি, আমার অতি প্রিয় ভাবী জীবনে আর কখনো আমার কাছাকাছি আসেননি। তবে নূর মোহাম্মদ চৌধুরী নামটি আমার স্মৃতিতে চিরজাগরুক হয়ে রইলো।

১৯৬১ সালে আমিও বগুড়া আযীযুল হক কলেজে ভর্তি হলাম। সেই চিঠির কথা এবং তার ঠিকানা আমার মনে ছিল। একদিন বিকেলে কলেজ থেকে ফেরার পথে কালিতলায় তার মেসে গেলাম। তার সঙ্গে পরিচয় হলো। লম্বা–চওড়া, ফর্শা, স্বাস্থ্যবান এমন মানুষকে একবার দেখলে কখনো ভোলা যায় না।

বললাম, আপনার ছোট বোনের ননদ মীনা আমার ভাবী হয়।

তুমি কি খোকা?

হ্যা।

আমার বোনের কাছে তোমার কথা শুনেছি। সেদিন তার সঙ্গে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিলাম।

তার সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে গেল। তিনি আমাকে খুব সমাদর করলেন। ক্রমেই আমাদের মাঝে আন্তরিকতা বাড়তে থাকে এবং মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের মাঝে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

আমার সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য অথবা অদৃষ্ট লিপি যাই হোক না কেন, সে বছরই ৭ ডিসেম্বর কাউকে কিছু না জানিয়ে তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হয়ে করাচি চলে যাই। এটি ছিল আমার জীবনের এক মস্তবড় ভুল সিদ্ধান্ত যে কারণে আমার সারা জীবন দুঃখ–কষ্টের মধ্যে কেটেছে। কিন্তু এসব কথা এখন থাক।

১৯৬৪ সালে আমি পি.এন.এস শাহজাহান নামে পাকিস্তান নৌবাহিনীর একটি ফৃগেটে কর্মরত ছিলাম। গ্যাংওয়ে জাহাজের আগমন নির্গমনের পথ যেখানে ২৪ ঘণ্টা ডিউটিতে লোক থাকে। এক রবিবারে গ্যাংওয়েতে আমার ডাক পড়লো মেহমান এসেছে। করাচি–তে আমার অতিথি? খুব আশ্চর্য হলাম। গ্যাংওয়েতে গিয়ে নূরভাইকে দেখে আরো আশ্চর্য হলাম।

বিএসসি পাস করার পর নূরভাই পিআইএ অর্থাৎ পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সে যোগদান করে। ট্রেনিং–এর জন্য করাচি এসে আমার খোজ পড়ে। তার ছোট বোন আবার আমার ভাবীর কাছ থেকে আমার ঠিকানা সংগ্রহ করে তার কাছে পাঠায়। সেই থেকে আমার কাছে তার আসা শুরু হয়। প্রায় প্রত্যেক রবিবার নূরভাই আমার জাহাজে আসতেন। সারাদিন আমার সঙ্গে কাটাতেন। সন্ধ্যার আগে তাকে ডকইয়ার্ড গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতাম। কোনো কোনোদিন গেটের কাছাকাছি এসে জিজ্ঞাসা করতেন, বাড়ির চিঠি পেয়েছো?

হ্যা পেয়েছি।

তোমার ভাইয়া এখন কোথায় আছেন?

দিনাজপুরে। তুমি সম্ভবত মীনা ভাবীর কথা জানতে চাইছো। তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। দোয়া করো নূরভাই।

এমনিভাবেই দিন কাটছিল। মনে আছে ১৯৬৫ সালে ৬ সেপ্টেম্বর পাক–ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই নূরভাই করাচিতে তার ট্রেনিং শেষ করে আবার ঢাকায় ফিরে যায় এবং মাঝখানে আরো অনেক কয়েক বছর কেটে যায়।

১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঢাকায় বাংলাদেশের নৌবাহিনীর সদর দফতরে গোয়েন্দা বিভাগ এফএসএস–এ কর্মরত ছিলাম। এ সময় বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক ঘটনা ঘটে। আমি ইতিহাসের দিকে যেতে চাই না। তবে সম্ভবত ১৯৭৭ সালের ১ অক্টোবর জাপান এয়ারলাইন্সের একটি ছিনতাইকৃত যাত্রীবাহী বিমানকে তেজগাও এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করানো হয়েছিল। সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন এবং সাংবাদিকরা সে সময় এয়ারপোর্টে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। যতো দূর মনে পড়ে, কনট্রোল টাওয়ারের দোতলা থেকে ছিনতাইকারীদের সঙ্গে তৎকালীন বিমানবাহিনীপ্রধান এ.জি মাহমুদ কথা বলছিলেন। সেখানে ঠিক সেই মুহূর্তে নূরভাই–এর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়।

গল্পটা এখান থেকে শুরু করলেই ভালো হতো। তাহলে মীনাভাবীর কথা কি বলা হতো? আমার ভাই–ভাবী তখন দুই পুত্র সন্তান নিয়ে সুখী দম্পতি। দুই এক ঈদের ছুটিতে বাড়িতে তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। নূরভাই যে তখনো বিয়ে করেননি এ কথা ভাবীর কাছেই জেনেছি।

একদিন মহাখালীতে তার ভাড়া বাসায় গেলাম। দুই রুম বিশিষ্ট বাসা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অফিসের পিয়ন তার বাজার ও রান্না করে দেয় এবং তার সঙ্গেই থাকে। তখন আমি সপরিবারে নৌবাহিনীর কলোনিতে থাকতাম। তাকে আমার বাসায় আসার আমন্ত্রণ জানালাম।

আমার মেয়ের বয়স তখন চার বছর এবং আমার স্ত্রী তখন দ্বিতীয়বার গর্ভধারণ করেছে। বলতে গেলে অ্যাডভান্স স্টেজ। তা সত্ত্বেও আমরা স্বামী–স্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয়ী হলাম, যেভাবেই হোক নূরভাইকে পারিবারিক জীবনে আকৃষ্ট করবো। আমাদের আচার আচরণে তিনি যেন মুগ্ধ হয়। সে যেন হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারেন স্ত্রী ও সন্তানের আদরই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তরুণ মনের একটি সামান্যতম ভুলের খেসারত যেন তাকে সারা জীবন বহন করতে না হয়।

নূরভাই–এর সঙ্গে সাপ্তাহিক ছুটিগুলো আমাদের খুব আনন্দে কাটতে থাকে। আমার মেয়ে বড় চাচাকে কাছে পেলে তার কতো আবদার।

কোনো কোনোদিন খেতে বসে নূরভাই রেগে যেতেন। বলতেন, শেফালি, তোমার শরীরের এই অবস্থা, তারপর এতো আয়োজন করেছো কেন? এমন করলে আর আসবো না।

কিন্তু পরের রবিবার আবার আসতেন। আমাদের ওপর তার খুব মায়া ধরে গিয়েছিল।

অনেক খোজাখুজির পর আমার এক সহকর্মী বন্ধুর ছোট বোনকে আমার খুব পছন্দ হলো। চেহারা এবং চাল–চলনে মীনাভাবীর মতোই সাধারণ। একই কলোনিতে আমরা থাকি। মেয়েটি কলেজে পড়ে। একদিন সেই সহকর্মী বন্ধুকে নূরভাই–এর অতীত ইতিহাস, বিয়ের প্রতি অনীহা ইত্যাদির কথা বললাম এবং বিয়ের প্রস্তাব দিলাম। বন্ধুটি সানন্দে রাজি হলো। তবে তার আগে পাত্রপাত্রীর চেনাজানার প্রয়োজন আছে। সে কারণে আমার বাসায় তার স্ত্রী ও বোনের অবাধ আসা যাওয়ার অনুরোধ তাকে জানালাম। এভাবেই ১৯৭৭ সাল শেষ হলো এবং ১৯৭৮–এর ৪ জানুয়ারি আমরা

একটি পুত্র সন্তান লাভ করি। স্ত্রীর প্রসূতির কারণে বেশ কিছু সময় যায়। সঠিক কাজটি করার আগে একটি সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।

আমার নবজাত সন্তানের বয়স তখন তিন মাস। মায়ের মতো ফর্শা, বেশ নাদুসনুদুস চেহারা। নূরভাই বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করছেন। বললাম, নূরভাই, একটি কথা।

বলো, বলো।

আমার বাবু দেখেন কেমন হাসছে।

হ্যা, হাসি আনন্দেরই ব্যাপার।

আমরা তোমার বিয়ে ঠিক করেছি।

ভুল করেছো।

সব মানুষেরই ৯৪% ভাগ সিদ্ধান্ত ভুল, বিয়ে করাটাও একটি ভুল সিদ্ধান্ত। তুমিও এই ভুল কাজটি করো নূরভাই।

আমার স্ত্রীও তখন আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আমরা তাকে খুব করে বোঝাতে লাগলাম। এক সময় বললাম, এই শিশুটিকে তুমি বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরো। এই ভালোবাসার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনো ভালোবাসার তুলনা হয় না। তাছাড়া আমার ভাবীব জন্য সারা জীবন কষ্ট পাবে এটাও হয় না।

তোমার ভাবীর প্রসঙ্গ থাক।

থাকবে কেন? সে যদি তোমার চিঠিগুলো না নিতো তাহলে তুমি তাকে ভুল বুঝতে না।

তখন সেও বোঝেনি। আমিও বুঝিনি। তাছাড়া পুরুষের চেয়ে মেয়েরা অনেক বেশি স্থিতিশীল।

ভালো, খুব ভালো, তুমিও স্থিতিশীল হও। তাছাড়া এমন ঘটনা চারদিকে কতো ঘটেছে, অহরহ ঘটছে। প্রায় সকল নারী-পুরুষের হৃদয়ে এমন ঘটনার স্মৃতি কিছু না কিছু আছেই। তুমি একজন সাধারণ মানুষ, সারা জীবন এই রাজকীয় দুঃখ ভোগ করে কোনোদিন সেই রাজ্য বা সিংহাসন ফিরে পাবে না।

সেদিন অনেক কথা হলো। কিন্তু কাজ হলো না। এর মধ্যে আমার বদলির অর্ডার হলো। বি.এন.এস আলী হায়দার নামে লন্ডন থেকে একটি ফ্রিগেট আসবে, সেই পার্টিতে আমার নাম এসেছে। মে মাসে লন্ডন যাবো। হাতে মাত্র এক মাস সময়। এর মধ্যে বাড়িতে ফ্যামিলি রেখে আসতে হবে। নূরভাই সেই যে গেছেন আর আসেন না।

একদিন বাচ্চা-কাচ্চাসহ তার বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। এবার আমি নই, আমার স্ত্রী তার সঙ্গে কথা বললো। দুজনেই স্বল্পভাষী এবং অল্প কথাতেই কাজ হলো। বিয়েতে তার সদয় সম্মতি পাওয়া গেল। এবার আমার দিকে চেয়ে বললে, বিয়ে মানে বৈধ যৌনতা, সন্তান লালন-পালনের নীল কারাগার।

আমার মেয়েকে তার দিকে ঠেলে দিয়ে বললাম, মেয়েকে স্পর্শ করে এ কথা বলো?

নূরভাই হাসলেন এক রহস্যময় হাসি। বললেন, পাত্রীটি কে?

নাহার।

সহকর্মী বন্ধুর বোনটির কথা বললাম। খুব ভালো করে বললাম।

দ্যাটস রাইট। তাই তো বলি এমন বাদলা দিনে কে কবে বলেছিল একটি দুঃখের কথা। কে ফেলেছিল এক ফোটা চোখের জল। হাঃ হাঃ হা...।

তখন বুঝিনি। পরে, অনেক পরে সব কিছু বুঝেছি।

একদিন নূরভাইসহ সেই বন্ধুটির বাসায় গিয়ে বসলাম। মেয়েটিকে ফাইনালি দেখা হলো। তার সঙ্গে কথা বলা হলো। বিয়ের সব কথা পাকা করা হলো। দিন, তারিখ ধার্য করা হলো। খুবই অল্প লোকজন নিয়ে শাদামাটাভাবে এ বাসাতেই বিয়ের অনুষ্ঠান হবে এবং ফুলশয্যা হবে নূরভাইয়ের বাসায়।

কিন্তু নূরভাইয়ের জীবনে যে কখনো ফুলশয্যার রাত আসবে না এ কথা তখন মনে আসেনি। অনেক তুচ্ছ ঘটনা অনেক সময় বড় বড় আনন্দকে নষ্ট করে দেয়। মনে আছে, সেদিন দুটার পর পরই বাসায় ফিরেছিলাম। খাওয়া–দাওয়ার পর স্ত্রী বললো, আমার কাছে নাহার আজ একা এসেছিল।

বললাম, ভালো।

ভালো নয়, সে খুব কাদছিল। নাহারের আগে একবার বিয়ে হয়েছিল।

আমি চমকে উঠলাম, বলো কি?

হ্যা, ছেলেটি সুবিধার ছিল না। তিন মাস পরেই তাদের ডিভোর্স হয়। ভাই–ভাবী এ কথা প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু নাহার এ কথা প্রকাশ করতে চায়। সে তার ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতারণায় যেতে চায় না।

আর মাত্র তিন দিন পরে বিয়ে! তার মধ্যে এই কথা? মনটা কষ্টে ভরে গেল। সেই বিকেলে নূরভাইয়ের বাসায় হাজির হয়ে সব কথা তাকে বললাম। জীবনে যখন নিদারুণ দুঃখ, কষ্ট নামে তখন মানুষকে তার কর্তব্যের কথাই প্রথমে ভাবতে হয়। তখন ভেঙে পড়লে চলে না। তবু আমার খুব অনুতাপ হচ্ছিল।

সব শুনে নূরভাই বললেন, সত্যি প্রকাশ করে মেয়েটি নিজেকে সম্মানিত করেছে এবং আমাকে ক্ষমা করেছে।

সেই মুহূর্তে তার ব্যথাতুর মুখের ওপর ম্লান হাসির ছটা ছড়িয়ে পড়লো। হয়তো নতুন করে তার প্রেয়সীর কথা মনে পড়লো। তিনি বলতে লাগলেন, নারীদের পটলচেরা দুটি চোখে, চুলে, চুলের গন্ধে আর দৈহিক রক্তে অনেক রহস্য লুকিয়ে থাকে যেন তুমি আমার রইলে না কিন্তু চিরকালই আমি তোমার রইলাম। কিছু কিছু কথা আছে যা তোমার ভাবী তোমাকে বলেনি, আমিও বলিনি। ওই নাহার মেয়েটিকে ক্ষমা করো। সব মানুষেরই এমন গোপন কিছু কথা থাকে যা অন্যকে কখনো বলা যায় না। তুমি অনুতাপ করছো? আমি কখনো অনুতাপ করি না। জীবনের খসড়া আগেই আমি একে রেখেছি। ভুল হলে মনে করবো সে ভুল সৃষ্টির, আমার নয়। আমি একজন ভাগ্যহীন মানুষ। আমাকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে নিজেকে কখনো কষ্ট দিও না। তুমি এখন এসো খোকা।

এর অল্প কয়েকদিন পরে লন্ডন চলে যাই। নূরভাই–এর কাছ থেকে অনেক দূরে গেলাম।

গ্রামের বাড়িতে এখন অবসর জীবন যাপন করছি। বাংলাদেশ বিমান থেকে অবসর নিয়ে নূরভাই এখন বগুড়ায় আছে। মানুষের জীবনটাই যেন এমন। এই কাজ, এই অবসর। এই কাছে এই দূরে। এই আছে, এই নেই। এই জন্ম, এই মৃত্যু।

১৯৯৬ সালের ১৯ মার্চ আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এই অকাল মৃত্যুতে এমনি শোকাতুর অনুভূতি আমাকে ব্যাকুল করেছিল। এমনি পর্যায়ে নূরভাই–এর একটি ছোট্ট চিঠি পাই। আমার স্ত্রীকে দেখতে পারেনি। কিন্তু আমাকে একবার দেখতে চায়। সে অসুস্থ।

একদিন বগুড়ায় মালতিনগরে তার বাসায় গেলাম। তিন তলা বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাট বাড়ির নিচ তলায় নূরভাই থাকেন। আমাকে দেখে খুব ব্যথিত হলেন। বার বার আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তার গ্রামের একজন লোক তার সঙ্গে থাকে। তাকে দেখাশোনা করে। তাকে বড় বড় সব খাবারের হুকুম দিতে লাগলো। আর আমি দেখছিলাম তাকে। ডান পা খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাটছেন, ডান হাত নড়ছে না, মুখ ডান দিকে বেকে গেছে। ডান চোখও মনে হলো ছোট। নূরভাই বললেন, প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়েছি। ডাক্তার বলেছে এর বেশি ভালো হবে না।

সেদিন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ছিলাম। তার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। এক সময় তাকে বললাম, ভাসমান মানুষের সব কিছু কম থাকা ভালো। ভাসতে কষ্ট হয় না। আমার মনে হয় তুমি আমার চেয়ে বেশি ভালো আছো।

আমার এ কথায় তার বয়স ক্লান্ত মুখে যেন গভীর পরাজয়ের ছায়া নেমে এলো। বললেন, না। আমি ভুল করেছি। যৌনতায় কৃচ্ছ সাধন করে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু হওয়া যায়, প্রেমিক হওয়া যায় না। আমার এ জীবন ভালো নয়।

নূরভাই এখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত। কিছুদিন আগে তার বোনের একটি চিঠি পেয়ে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। একেবারে অচল রোগী। অন্য লোক দ্বারা তার শুশ্রূষা সম্ভব নয় বলে পালা করে এক বোন তার সঙ্গে থাকে। সেই সুন্দর চেহারার মানুষটি কতো অসুন্দর হয়েছেন। তাকে দেখে আমার খুব মায়া হলো, কান্না এলো।

তার বোনটি বললেন, মীনাকে একবার দেখতে চায়। সে জন্য তোমাকে আসতে বলেছি ভাই।

ভাবী এখন বিধবা। দুই ছেলের সঙ্গে নওগা থাকেন। বগুড়া থেকে আবার নওগা রওনা হলাম।

প্রথমে দুই ভাতিজার সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তারা সম্মতি দিলো। তারপর ভাবীকে নিয়ে যখন পুনরায় নূরভাইয়ের বাসায় পৌছালাম তখন রাত দশটা বাজে।

যে দেহকে নিয়ে এতো গর্ব সেই দেহ শেষ হয়ে গেছে। দেহ শেষ হলে হৃদয় কোথায় থাকে? প্রেম ভালোবাসা কোথায় থাকে? মানুষের অন্তিম বাসনা এতো বিচিত্র কেন! একটি সিঙ্গল ঘাটের ওপর উত্তর শিয়রে নূরভাই শায়িত। তার দুই চোখের পাতা বন্ধ। পাশে বোনটি নির্বাক বসে ছিলেন। নূরভাইয়ের শিয়রে আমি বসলাম এবং ভাবী তার বোনের পাশে বসলেন।

তার বোন আস্তে করে নূরভাইকে ডেকে বললেন, মীনা এসেছে।

নূরভাই চোখ মেলে ভাবীর দিকে তাকালেন। যৌবনকালের একটি অবাঞ্ছিত স্মৃতি তার অচল দেহকে হয়তো ক্ষণিক রোমাঞ্চিত করলো। আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। তার কপালে হাত রাখলাম।

বড়গাছা, জয়পুরহাট থেকে

কৃকেটীয়

– ইমামুল হাসান রহিম

ওগো, আমার পছন্দের স্টেডিয়াম মিস নার্গিস খানম। ২০০৩ সালের ওয়ার্ল্ড কাপ কৃকেটের শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখা শুরু করছি ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেনটাইনস দিবসের প্রেমপত্র।

নার্গিস, জানি না তুমি এখন কেমন আছো? তবে আমার প্রত্যাশা, ইনজুরি মুক্ত থাকার প্রিয় খেলা কৃকেটের মতো আমিও তোমার প্রিয় হতে চাই। ধরা দিতে চাই তোমার প্রেমের ফার্স্ট স্লিপে। আশা করি আমার এ আবেদনে তুমি সাড়া দেবে। এবং তোমার পূর্ববর্তী বন্ধুদেরকে এলবিডাবলিউ করে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠাতে সহায়ক হবে। আর আমার জন্য খুলে দেবে তোমার মনের ড্রেসিং রুম। ওপেনিংয়ে জুটি বাধবে আমার সঙ্গে। কেননা তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা শোয়েব আখতারের বোলিংয়ের চেয়েও দ্রুততর। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের চেয়েও অটল।

মিস এন.কে, বিশ্বাস করো, জীবনে কখনো ভুল করেও কোনো মেয়ের সঙ্গে ফিল্ডিং মারিনি। গর্ব করে বলতে পারি, প্রেমের খেলায় তোমার সঙ্গে এটাই আমার প্রথম ইনিংস। তাছাড়া আমার মনের স্কোর বোর্ডে কেবল তোমারই নাম নার্গিস, নার্গিস, নার্গিস। আমার সমস্ত পারফরমেন্স জুড়ে কেবল তুমি। তোমাকে ভালোবেসে গড়তে চাই জীবনের নতুন রেকর্ড এবং তোমার জমিনে হাকাতে চাই চার ও ছক্কা।

নার্গিস, তুমি যদি ঠিক থাকো তাহলে আমার বিশ্বাস, আমাদের এ পবিত্র ভালোবাসা ওয়ানডে কৃকেটের মতো মাত্র সাতশ ঘণ্টায় শেষ হয়ে যাবে না। হবে না বৃষ্টি বিঘ্নিত কিংবা পরিত্যক্ত। জ্বলবে না কখনো বিরহের রেড লাইট। বরং ডিসেম্বর টু জানুয়ারি বারো মাস ডে–নাইট চলবে তোমার–আমার ভালোবাসার এ খেলা। এ খেলায় দুজনেই জয়ী হবো। ভাগ করে নেবো জীবনের সুখ–দুঃখের পয়েন্টগুলো।

ওগো আমার শ্যামলা বর্ণের জার্সি! তোমাকে ভালোবেসে পেতে চাই সামাজিক টেস্ট স্টেটাস। তুমি চিন্তা করো না, স্বপ্নের এই সুন্দর ক্যাচটি বাস্তব হয়ে একদিন ধরা দেবেই তোমার–আমার জীবনের তুলতুলে গ্লাভস–এ। এবং সে পর্যন্ত তুমি হিটআউট না হয়ে নটআউট থাকো এই প্রত্যাশায় আপাতত টি–ব্রেক।

তেজগাও, ঢাকা থেকে

ইঞ্জিনিয়ার

– গিয়াস উদ্দিন লিটন

আবদুল কুদ্দুস। বয়স ত্রিশের মতো হবে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, বাড়ি হবিগঞ্জ। একটা বিদেশি সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের নির্মাণ কাজে সোনাগাজীর এ গ্রামে এসেছে। মার্জিত ব্যবহার আর বন্ধুবাৎসল্যের কারণে অল্পদিনেই আমাদের মতো অনেকের সঙ্গে তার খুব ভালো একটা

সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কারো সঙ্গে যে খারাপ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়নি এমনো নয়। সাবকন্ট্রাক্টরের স্থানীয় কিছু শ্রমিক তার ওপর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে বড়ই নাখোশ।

এই এলাকায় বেশ কিছুদিন থেকে একটা অল্প বয়সী পাগলির আনাগোনা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। অতি উৎসাহী কিছু লোক এটাও লক্ষ্য করেছেন যে, পাগলিটার পরনে প্রায়ই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের পাঞ্জাবি, প্যান্ট শোভা পাচ্ছে।

প্রতিদিনের মতো একদিন সকালবেলা ইঞ্জিনিয়ারের সাইট সংলগ্ন চায়ের দোকানে গেলাম। চা দোকানের সবাই এতোক্ষণ কি একটা বিষয় নিয়ে বেশ রসালো আলাপ করছিল। আমাকে দেখে সবাই চুপচাপ। চা খেয়ে দোকান থেকে পালের গোদা কাশেমকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ব্যাপার কি জানতে চাইলাম।

কাশেম বললো, গতরাতে এক নির্জন স্থান থেকে তারা ইঞ্জিনিয়ার আর পাগলিকে আপত্তিকর অবস্থা থেকে ধরে এনেছে। পাগলিকে দুই চার ঘা আর ইঞ্জিনিয়ারকে বেশ ধোলাই দেয়া হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার বেটা রাত থাকতেই কাপড়–চোপড় নিয়ে ভেগেছে।

বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার মতো কোনো প্রমাণ না পেয়ে বেশ অস্বস্তিতে ভুগছিলাম।

ঘটনার বারো দিন পর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের একটা চিঠি পেলাম। ইঞ্জিনিয়ার লিখেছে –

...আমি তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী। ছোট বোন রেখা ক্লাস নাইনে, তার পরের বোনটি এইটে। ব্যবসায়ী বাবা আর গৃহিণী মাকে নিয়ে খুবই সুখের সংসার আমাদের। সুখের পরেই নাকি দুঃখ আসে। বুঝলাম যখন ছোট বোন রেখা কামার পাড়ার এক হিন্দু ছেলের সঙ্গে পালালো। সারা পাড়ায় ছিঃ ছিঃ পড়ে গেল। আমি আর ছোট বোন শিখা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। সাতাশ দিনের মাথায় হেডমাস্টার এসে স্কুলে নিয়ে গেলেন আমাদের।

...রেখা পালিয়েছে এক বছরের উপর হলো। *ঘরপোড়া গরু সিদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।* শিখার বিয়ের বয়স যদিও হয়নি তারপরেও বাবা উঠেপড়ে লাগলেন তাকে বিয়ে দিতে।

রেখার কেলেংকারিটা যারা জানে অর্থাৎ আমাদের আশপাশের দুই চার গ্রামের কোথাও থেকে বিয়ের কোনো প্রস্তাব আসেনি। দূর–দূরান্তের কোনো গ্রাম থেকে যদিও বিয়ের প্রস্তাব আসে একই কারণে তাও ভেঙে যায়। বাবার টেনশন, মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, আমাদের সঙ্গে রাগারাগির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল।

পাকা রাস্তার পাশেই আমাদের বাড়ি। একদিন ভোরে মা উঠানে একটা পাগলিকে দেখে রেখা বলে চিৎকার দিয়ে পড়ে যান। আমি, বাবা, শিখা চিৎকার শুনে বেরিয়ে আসি। মাকে নিয়ে বাবা আর শিখা টানাটানি করছে আর আমি গিয়ে পাগলিটাকে কয়েক ঘা লাগিয়ে দেই।

মার হুশ ছিল। চিৎকার করে দৌড়ে এসে আমাকে বাধা দেন। বললেন, ভালো করে দেখ, কাকে মারছিস, ও আমাদের রেখা।

...আমরা এ কাকে দেখছি। পরনে একটা নতুন গামছা, গায়ে ময়লা একটা কোট।... করুণ পর্ব শেষে রেখাকে গোসল করাতে নিয়ে গেলে তার কোটের পকেটে একটা চিঠি পাওয়া যায়। পত্র লেখক লিখেছে, আমার সাধ্যের মধ্যে সব রকমের চিকিৎসা তাকে করিয়েছি। সে এখন চিকিৎসার অনেক

ঊর্ধে। প্রায় এক মাস নিরুদ্দেশ থাকার পর আপনাদের শহরেই তাকে খুজে পেয়েছি। কোথায় নেবো ভেবে পেলাম না। তাই আপনাদের এখানেই রেখে গেলাম। আমাকে ক্ষমা করবেন।

বদ্ধ উন্মাদ রেখাকে আট দিন একটা ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হলো। আমাদের ঘরের লোক ছাড়া আশপাশের কেউ রেখার অস্তিত্ব যেন টের না পায় সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এই আট দিনে তার পরনে কোনো কাপড় পরানো যায়নি, কোনো কিছু মুখেও দেয়নি। মা সারাক্ষণ কান্নাকাটি করেন।

আমি, শিখা পারতপক্ষে বিবস্ত্র রেখার সামনে যাই না। বাবার হাবভাবে বোঝা যায়, রেখাকে খুন করে মাটি চাপা দিতে পারলেই যেন তিনি বাচেন। আমার এক মামা মাইক্রোবাস চালাতেন। নবম দিন ফজরের নামাজের আগে গাড়ি নিয়ে মামা এলেন। কোনো রকমে আমার একটা প্যান্ট পরিয়ে রেখাকে টেনে হেচড়ে গাড়িতে তোলা হলো। মায়ের সে কি বুক ফাটানো আর্তনাদ। আমি আর শিখাও কাদছি। বাবাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস না পেয়ে মামাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, রেখাকে চিকিৎসার জন্য পাবনা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পরের দিন সন্ধ্যায় বাবা ফিরলেন। এই প্রথম বাবাকে কাদতে দেখলাম। সারা রাত তিনি কাদলেন। ফজরের পরে আমাকে ডেকে বললেন, তোর মামাকে গাড়ি নিয়ে আসতে খবর দে।

আমি লক্ষ্য করলাম, এক রাতে যেন বাবার বয়স অনেক বেড়ে গেছে। চোখ কোটরে যেন এক অথর্ব বৃদ্ধ।

গাড়ি নিয়ে মামা আর বাবা আবার বের হলেন। তিন দিন পর দুপুরবেলা মাইক্রোবাস এসে থামলো আমাদের বাসার সামনে। মামা দরজা খুলে দেখেন পেছনের সিটে হেলান দিয়ে বাবা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বাবার এ ঘুম আর কখনো ভাঙেনি। আমাদের উপর্যুপরি শোকের সাগরে ভাসিয়ে বাবা চিরতরে চলে গেলেন।

পরে মামার কাছে শুনেছি, তারা দুজনে মিলে রেখাকে কয়েকশ মাইল দূরে কোনো এক স্থানে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। পরের দিন বের হয়ে মামা আর বাবা তিন দিন পর্যন্ত রেখাকে খুজেছেন, কোথাও পাননি। এই তিন দিনে বাবা কিছুই খাননি, শুধু রেখা রেখা বলে কেদেছেন।

সেদিনের পর থেকে পথ–ঘাটে কোনো পাগলিকে দেখলে আমার হারিয়ে যাওয়া বোনের কথা মনে পড়তো। এদের মাঝে আমার রেখাকে খুজে পেতাম যদিও জানি এরা কেউ সত্যিকার আমার বোন নয়। তারপরও এরা তো কারো না কারো আদরের বোন ছিল।

সেদিন আপনাদের এলাকায় আমার ওই পাগলি বোনটিকে বিবস্ত্র দেখে আমার একটা প্যান্ট পরানোর চেষ্টা করছিলাম। এরপরের ঘটনা তো নিশ্চয় আপনি জানেন।

সোনাগাজী, ফেনী থেকে

আঠারো বছর

মনে পড়ে তোমার?

সেই অনেক বছর আগে যখন আমরা দুজনেই খুব ছোট ছিলাম। আমি মাত্র স্কুলের পেরিয়েছি আর তুমি আমার থেকে পাচ ক্লাস উপরে পড়ো। আমরা এক সঙ্গে কতো খেলেছি, ঘুরেছি, এমনকি তোমাদের বাসায় প্রায়ই গিয়ে থাকতাম। তোমার মনে পরে কি? এক সময় আমার মায়ের অসুখের জন্য তোমাদের বাড়িতে ছিলাম অনেক দিন। তখন তোমার মা আমাদের দুজনকে কোলে বসিয়ে এক সঙ্গে খাইয়ে দিতেন, ঘুম পাড়িয়ে দিতেন একই বিছানায়। তখন আমি স্কুলে ভর্তিও হইনি। তোমার সঙ্গে খাতা–বই নিয়ে বসতাম। তোমার পরিবারের সবাই আমাকে খুবই ভালোবাসতো। সেই তখন থেকেই আমার ছোট কচি মনটা শুধু তোমাকে ভালোবাসতো। ভালোবাসা তখন কি আর বুঝতাম? এটুকুই বুঝতাম যে, তুমি যা করো, যা বলো, সবই আমার ভালো লাগে। এরপর স্কুলে যাওয়া শুরু হলো আমার। আমি তখন ক্লাস টু–র ছাত্রী।

অন্য দিনের মতো সেদিনও তোমাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তুমি কি মনে করতে পারছো? একটু চেষ্টা করো! প্লিজ। তোমার চেয়ে আমি কতো ছোট তখন তাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তুমি সেদিন আমাকে হঠাৎ একা ডেকে নিয়ে তোমাদের পড়ার ঘরে গেলে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তোমার ডাকে সাড়া দিতে এগিয়ে গেলাম। তুমি বললে, সোনামণি, এখানে তোমার নামটা লেখো তো দেখি।

তোমার খাতায় আমার পূর্ণ নামটা লিখে দিলাম।

তুমি বললে, বাহ! তোমার হাতের লেখা তো চমৎকার হয়েছে। এই বলে তুমি আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিলে।

এ রকম আকস্মিকতায় ভয় পেয়েছিলাম ভীষণ।

কারো পায়ের শব্দে তুমি তাড়াতাড়ি আমায় ছেড়ে দিলে। মিষ্টি একটি হাসি দিয়েছিলে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি কি বুঝেছিলাম জানি না, দ্রুত তোমার ঘর থেকে চলে গিয়েছিলাম। আর আম্মাকে বাসায় যাবার জন্য ব্যস্ত করে তুলেছিলাম। সেদিন আর তোমাদের বাসায় আমার ভালোলাগছিল না। এরপর থেকেই তোমাদের বাসায় গেলে ভয়ে ভয়ে থাকতাম এবং তোমার থেকে দূরে দূরে থাকতাম। এটা তুমি বুঝতে পারতে ও হাসতে।

তুমি কি মনে করতে পারছো? হয়তো পারছো না। কারণ অধিকাংশ ছেলেরাই এসব ভুলে যায়। তবে তোমার মনে থাকার কথা, ভোলার কথা নয়। কেননা ছাত্র হিসেবে তুমি ভালো ছিলে এবং তোমার মেমোরি ভীষণ শার্প। আমার সবই মনে আছে। মনে আছে সেই দিনের সেই ঘটনা। পরবর্তী কালে আমাকে একটি স্বপ্ন দেখিয়েছিল। তুমি জানো, আস্তে আস্তে আমি যতো বড় হয়েছি, তোমাকে ঘৃণা করার বদলে আরো ভালোবেসেছি। জানি না আর কোনো মেয়ের এমন হয় কি না। তবে আমার হয়েছে। অবশ্য তোমাকে ভালোবাসার অনেক কারণ ছিল। সেদিনের সেই আকস্মিক ঘটনা ছাড়া তোমার চরিত্রের অনেক কিছুই আমাকে আকর্ষণ করতো এবং ছোটবেলা থেকেই ভালোলাগার ব্যাপারটা তো ছিলই।

তুমি ছিলে সুন্দর, স্মার্ট, ভালো ছাত্র, সর্বোপরি তোমার ব্যক্তিত্বই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। তবে আমার দুর্বলতা কখনোই তোমাকে বুঝতে দিইনি এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে তুমি। খেয়াল করেছো

নিশ্চয়ই যে, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে তোমাদের বাসায় যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিলাম। এমনকি বছরে দুবারও হতো কি না সন্দেহ।

এর মধ্যে আমার জীবনেও ঘটে গেছে অনেক চড়াইউৎড়াই। আমার শিক্ষা জীবনে ঘটেছে চরম বিপর্যয়। সবই তুমি জানো। জানো, আমি জানতাম তোমার সঙ্গে আমার কখনোই সম্পর্ক হবার নয়। কেননা পারিবারিক ব্যবধান। তবুও মনে ক্ষীণ একটি আশা ছিল। যদি কখনো যোগ্য হই তবে তোমার সামনে গিয়ে দাড়াবো। কিন্তু আমার শিক্ষা জীবন আমার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। ইতিমধ্যে সময়ও পেরিয়ে গেছে অনেক। অনেকের মুখেই শুনেছি তুমি একটি মেয়েকে ভালোবাসো। কখনো বিশ্বাস করিনি। মনে মনে বিশ্বাস করতাম, আমিই বুঝি তোমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা। কি বোকা আমি, তাই না? তুমি কেন আমায় মনে রাখবে? কি দায় তোমার? আর আমিও তো কখনো তোমাকে আমার অনুভূতির কথা জানাইনি। বরং দূরে দূরে থেকেছি যাতে আমার দুর্বলতা প্রকাশ না পায়।

যাক, তোমাকে দোষ দিই না। সবই আমার নিয়তি। জানো, প্রথম যেদিন তোমাকে আর তোমার ভালোবাসার মানুষটিকে দেখেছিলাম সেই দিন কেন জানি খুব কেদেছিলাম। কেন কেদেছিলাম? আমি তো জানতামই তুমি অন্য কারো হবে। তোমার বিয়েতে নিমন্ত্রণ দিলে।

গেলাম। তুমি তখনো বুঝলে না যে, আঠারো বছর ধরে তুমিই আমার হৃদয় জুড়ে আছো। অবশ্য তোমার কি দোষ? আমিই তো তোমায় বুঝতে দিইনি।

আজ আমি নিঃসঙ্গ। এ পর্যন্ত কাউকে আপন করতে পারিনি। আর তুমি দিব্যি সংসার করছো।

বলতে পারো, কেন সেই ছোটবেলায় সেদিন এমন করেছিলে আমার সঙ্গে? তুমি যদি সেদিন এমন না করতে তবে হয়তো তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতাম না। আমার জীনটাও তোমার মতোই সুখের হতো। কেন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা নষ্ট হয়ে গেল বলতে পারো?

জানি, এ চিঠি তোমার চোখে পড়বে না। এর জবাবও কোনোদিন পাবো না। তবুও লিখলাম। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়া আর কি!

আমার না হোক, তোমার সুখ হোক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে

জোয়ার ভাটা

– ডা. হেলাল খান

আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স–এর ছাত্র। অনার্স পাস করার পর পরই এক সরকারি প্রজেক্টে চাকরি পাওয়ায় ঢুকে পড়লাম। ফলে দীর্ঘ দুই বছর চাকরি করার পর পুনরায় মাস্টার্স–এ ভর্তি হই। সেই পুরনো জায়গা। স্মৃতিবহুল ব্রহ্মপুত্রের পাড়, বোটানিকাল গার্ডেন, বিশাল ফুলের বাগান এবং ক্যাম্পাসের রেখে যাওয়া ঘটনাগুলো।

এদিকে বাড়িতে বিয়ের কথাবার্তা চলছে। বাবা বেচে না থাকায় মায়ের ইচ্ছা পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী দেখে তার দায়িত্ব সম্পন্ন করা। আমিও পুরোপুরি মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকলেও মায়ের মতের বিরুদ্ধেও ছিলাম না। তাই মাঝে মধ্যে পার্ক, রেস্টুরেন্ট কিংবা তৃতীয় কোনো পক্ষের বাসায় মেয়ে দেখা আর রাতে বিছানায় শুয়ে রঙিন স্বপ্নের রাজ্যে গড়াগড়ি খাওয়া এসব মিলিয়ে দিনকাল মন্দ যাচ্ছিল না।

আটাশ বছরের জীবনে দুই চারজন নারী যে আসেনি তা অস্বীকার করার দুঃসাহস আমার নেই। তবে তারা এসেছিল জোয়ারের মতো আর চলে গিয়েছিল ভাটার মতো দুমড়ে-মুড়চে সব কিছু। মেয়ে দেখার ধারাবাহিকতার মাঝেই একদিন দেখতে যাই মধ্যবিত্ত ঘরের এক মেয়েকে। পাত্রী বিএ-র ছাত্রী। লম্বা গড়ন, মোটামুটি সুন্দরী। তার সঙ্গে নিভৃতে আলাপকালে জানতে পাই, তারই ছোট বোন পড়ে আমার সেই স্মৃতিবিজড়িত কৃষি ইউনিভার্সিটিতে। সে সবেমাত্র ভর্তি হয়েছে সেখানে।

বিয়ের ব্যাপারে মতামত পরে জানাবো বলে চলে এলাম ময়মনসিংহে। হলে এসে হঠাৎ মাথায় খেয়াল চাপলো যে, হয়তো বা আমার হবু শ্যালিকা (?)-র সঙ্গে একটু পরিচিত হই। লেডিস হলের সামনে গিয়ে কল দিলাম। আমার পরিচয় দিতে গিয়ে শেষ করতে পারলাম না। সে নিয়ে গেল তাদের ভিজিটিং রুমে। সে আমার কথা কয়েকদিন আগেই সব শুনেছে। তার বোনকে পছন্দ হয়েছে কি না সরাসরি জানতে চাইলো।

কথাবার্তায় তাকে বেশ ফৃ মনে হলো। মনে হলো সে বোধহয় আমাকে হবু দুলাভাই হিসেবেই দেখছে। গল্পে গল্পে আমি বলে ফেললাম যে, তোমার আপা সুন্দর। তাকে আমার প্রাথমিকভাবে পছন্দ হয়েছে। তবে তোমার সঙ্গে আগে পরিচয় থাকলে তোমার বোনকে নয় বরং তোমাকেই প্রেমিকা হেসেবে, পরবর্তী কালে বৌ হিসেবে চাইতাম।

আমার এই দুষ্টমিতে সে হাসিতে ফেটে পড়লো। বললো, আমার মতো দুলাভাই পেলে সে ধন্য হবে। আমি ঠাট্টার ছলে বললাম, তোমার মতো শ্যালিকা যে পাবে সেও ভাগ্যবান।

রাতে হলে ফিরে এলাম।

আমার সঙ্গে সে যোগাযোগ রাখবে জানালো। দুদিন না গড়াতেই তার টেলিফোন এলো। বললো আজ সন্ধ্যায় হলে আসতে হবে। আমাকে নিয়ে তার এক আত্মীয়ের বাসায় যাবে।

নির্ধারিত সময়ে হাজির হলাম সেদিন। তার আত্মীয়ের বাসায় আমাকে অনেকটা হবু দুলাভাইয়ের মতো পরিচয় করিয়ে দিল। বুঝতে পারলাম তার ফ্যামিলির সবাই আমাকে পছন্দ করেছে জামাই হিসেবে। আত্মীয়ের বাসা থেকে বের হয়ে তাকে আহবান করলাম কোথাও গিয়ে একটু বসে গল্প করতে। সে রাজি হলো। প্রথমে হাটতে হাটতে ও পরে ক্যাম্পাসে বসে আমার কথাগুলো তাকে বলতে থাকলাম। তার বোনকে নয়, তাকেই আমি বৌ হিসেবে পেতে চাই।

সে আমার কথাগুলো ঠাট্টা হিসেবে নিতে লাগলো।

হাটতে হাটতে তার হলে পৌছালাম।

ওই দিন রাতে সে আমাকে তার হলের মাসিক ফিস্ট খাওয়ালো নিজে না খেয়ে। খেতে খেতে ওই ধরনের অনেক কথা হলো। সে আমাকে যত্ন করে খাওয়ালো। আরো অনেক সময় গল্প করতে

চাইলো। রাত হওয়ার কারণে ফিরে এলাম নিজ হলে। কিন্তু এই ঠাট্টা, ইয়ার্কি যে ভীষণ কাল হয়ে দাড়াবে ভাবিনি। পরদিন সকাল সাতটার দিকে তার টেলিফোন এলো।

রিসিভার তুলে জানতে চাইলাম, কি ব্যাপার, এতো সকালবেলা? রাতে কি ঠিক মতো ঘুম হয়নি?

উত্তরে সে জানালো যে, ঘুম হওয়ার মতো পরিস্থিতি আমি নষ্ট করেছি।

ঠিক মতো বুঝ উঠতে পারলাম না। ওই দিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে যেতে বললো তার হলে। খুবই জরুরি কথা আছে জানালো। ইউনিভার্সিটির সর্বশেষ পর্ব অর্থাৎ মাস্টার্স–এর ছাত্র হয়ে সবেমাত্র ভর্তি হওয়া ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রীর সঙ্গে হল গেটে কল দিয়ে আবারও দেখা করা, ব্যাপারটা কিছুটা বিব্রতকরও ছিল বটে। তবুও কৌতূহল নিয়ে গেলাম।

হাটতে হাটতে দুজনে ক্যাম্পসে এক নিরিবিলি জায়গায় বসলাম। তার কথাবার্তা আজ বেশ সিরিয়াস মনে হলো। ঠাট্টা, ইয়ার্কি নেই। পাশাপাশি বসার ফলে তার শরীরের উষ্ণ শ্বাস–প্রশ্বাসের শব্দ অনুভব করতে লাগলাম। আমার হাতে তার হাতের স্পর্শ পেল।

সে শুধু বললো, গতকালের কথাগুলো আমি মন থেকে বলেছি কি না?

আমিও জানালাম, সত্যিই মনের কথা।

তার হাতের স্পর্শ আমাকেও উষ্ণ করে ফেললো। আমি তার আরো কাছাকাছি বসে হাত থেকে চিবুক, চিবুক থেকে তার কাধ, কাধ থেকে তার ঠোট, ঠোট থেকে তার কম্পমান ব্রেস্ট স্পর্শ করলাম। বললাম, সত্যি তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

সে যেন ভালোবাসার এই ছোয়ায় আমাকেও উল্টো জড়িয়ে ধরলো। দুটি শরীর, মন ক্ষণিকের জন্য এক হয়ে গেল। ইউনিভার্সিটির একেবারে শেষ পর্যায় এসে নিজের কনে দেখতে গিয়ে কনের বোনের সঙ্গে এভাবে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠবে ভাবতে পারিনি, কল্পনাও করিনি।

সে আমাকে বললো, দুলাভাই হিসেবে আমাকে না পেলে তার যতোটুকু কষ্ট হবে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি কষ্ট হবে আমাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে না পেলে।

হবু দুলাভাই থেকে প্রেমিক। তারপর আমাদের সম্পর্ক বেশ এগোয়। ক্যাম্পাস পার হয়ে বাইরে, এক সময় দুজনের সম্মতিক্রমে বাইরে বেড়ানো এবং রাত কাটানোর মধ্য দিয়ে সম্পর্ক অনেক দূর গড়ায়।

কিন্তু আমাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাকে আমি পাইনি। সেটেলড ম্যারেজের পারিবারিক সম্মতি না পাওয়ায় তার সঙ্গে আমার পরিণয় হলো না। অনেক চেষ্টা করেও আমার পরিবারকে রাজি করাতে পারিনি। আজ দীর্ঘ পাচ বছর ধরে তাকে খুব মনে পড়ছে, দেখতে ইচ্ছে করছে। আমার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাকে পাইনি বধূ হিসেবে।

পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটে ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কষ্ট হলেও মেনে নিয়েছি ভাগ্যকে। তাকেও পারতে হবে সব কিছু মেনে নিতে। আমি অন্য এক অপরিচিতা মেয়েকে বিয়ে করেছি। সুখী হই বা না হই তাকেও বলবো সংসার করতে। তাকে সুখী সংসারী দেখাই হবে আমার বড় পাওয়া।

বাদুড়তলা, বগুড়া থেকে

শ্রেষ্ঠ উপহার

– এস ইসলাম

একদিন বিকেলে দোতলা বাড়ির ব্যালকনিতে কেদারা পেতে মাথার পেছনে উভয় হাত বেধে পা দুটোকে লম্বাভাবে রেখে সম্পূরক কোণে দোল খাচ্ছি এবং ভাবছি, ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বড় ভাইয়ের ঘাড়ে আর কতোদিন চেপে থাকতে হবে। কিভাবে বেকারত্বের অভিশাপটাকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে কূলে উঠতে পারি তার একটা পন্থাও মনে মনে খুজছি। এমন সময় অতি কাছ থেকে মেয়েলি কণ্ঠে সুমধুর গানের সুর বাতাসে ভেসে আমার কর্ণকুহরে আঘাত করতে লাগলো। আমি চমকিত হয়ে, পুলকিত হয়ে আরো মনোনিবিষ্ট করে শ্রবণ করতে লাগলাম। আমারও তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইতে ইচ্ছা করছিল, *এই বেকার জীবনে এতো সুখ সইবো কেমন করে।*

এতো আগে কখনো শুনিনি। তবে কি নতুন কারো আগমন ঘটেছে? পরে যা জানতে পারলাম তা এই রূপ – তার বাবা কেয়ারে চাকরি করেন। চাকরি বদলির বদৌলতে এই জেলায় তাদের স্থান হয়েছে। তারা দুই ভাইবোন। সে বড়। এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। কেবল নতুন এসেছে বলে এখন পর্যন্ত কোনো কলেজে ভর্তি হয়নি। সারাক্ষণ বাসায়ই থাকে।

ইতিমধ্যে আমার ভাবীর সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে উঠেছে। সেই সূত্র ধরে সে আমাদের বাসায় অহরহ আসতো। সারাদিন ভাবীর সঙ্গে আড্ডা দিতো। আমি সেদিকে কর্ণপাত না করে আমার নিজস্ব রুমে বসে সারাক্ষণ বই পড়ে সময় কাটাতাম।

একদিন সে এক কাপ চা হাতে আমার রুমে ঢুকে বললো, নিন, আপনার চা। আপনার রুমে এতো বই! আপনি এতো বই পড়েন! আমিও তো বই পড়ি। এই গল্পের বইটা আমি নিয়ে গেলাম, আগামীকাল ফেরত দেবো। এই বলে বেরিয়ে গেল।

আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগই দিল না। আমি শুধু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। পরে জেনেছিলাম এটি ছিল আমার ভাবীর কারসাজি।

পরবর্তী দিন বইটি ফেরত দিতে এসে বললো, আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন। অবশ্য কেউ আমার ওপর রাগ করলে আমার কিছু যায় আসে না।

কারো উত্তরের অপেক্ষা না করে একা একাই বলে যাচ্ছে। যেন আমি তার কতো দিনের চেনা পরিচিত। তার রূপ–লাবণ্য এতোই মনোমুগ্ধকর যে, তার প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত না করে পারবে না। তার রেশম কোমল কেশ, কাজল কালো চোখ, কমলার কোয়ার মতো ঠোট, টান টান বুক, উত্তাল নিতম্ব, ছল ছল চাহনি, উচ্ছল তারুণ্য, সুরেলা কণ্ঠ সব কিছু মিলিয়ে সে যেন আমাকে সম্মোহিত করে ফেললো। এই প্রথমবারের মতো তার একটি কথার জবাব দিলাম।

আল্লাহ যার এতো রূপ দিয়েছেন, এতো গুণ দিয়েছেন তার সঙ্গে কি রাগ করা যায়?

এতোদিন চোখে পড়েনি? সে বললো।

বললাম, চোখে নিশ্চয়ই পড়েছো। তবে আজকের মতো মনের চোখে পড়োনি।

সত্যি বলছেন তো! তাহলে আমার হাত ছুয়ে বলুন। এই বলে সে ডান হাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

সামান্য ইতস্তত করে আমার ডান হাতটি তার ডান হাতের ওপর রাখলাম। অমনি ত্বরিত গতিতে রক্তকণিকাগুলো শিরায় শিরায় ছুটোছুটি শুরু করে দিল। পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা পর্যন্ত। মনের ভেতর ঢেউয়ের পর ঢেউ বয়ে যেতে লাগলো। যেন এখনই বান ডাকবে। একে অপরের চোখের ওপর অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। কারো মুখে কোনো কথা নেই। নিস্তব্ধ। যুবতী নারীর সান্নিধ্যে এলে পুরুষের শিরায়–শিরায়, অনু–পরমাণুতে কতো রকম যে বৈকল্য সৃষ্টি হয় তা একমাত্র যুবতী নারীর সান্নিধ্যে যে পুরুষ এসেছে সেই বুঝতে পারে, সেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে তার ব্যাকুলতা।

আমি তার আবেশী শক্তির টানে তার নিকট থেকে আরো নিকটতর হলাম। চুম্বকের মতো আমার ঠোট চলে গেল তার ঠোটের ওপর। ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলাম এ জগতের সব কিছু। ঘুরে এলাম অন্য এক জগৎ থেকে।

এরপর থেকে প্রায়ই আমরা একে অপরের কাছাকাছি হতাম। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শুনতে পেতাম একে অপরের হৃদয় স্পন্দন। চুমোয় চুমোয় ভরে দিতাম একে অপরকে। আমাদের মাঝে সৃষ্টি হলো আরো মিলন। আবদ্ধ হলাম বিনা সুতার বাধনে, আবদ্ধ হলাম ভালোবাসার বন্ধনে।

ইতিমধ্যে আমি পি.সি.এস কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে নিয়োগ প্রাপ্ত হই। যে বড় ভাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিল তিল করে আমাকে মানুষ করেছেন, যার অবাধ্য হয়নি কোনো দিন, যার মুখের ওপর কথা বলিনি কোনোদিন যে আমাকে নিয়ে সকলের কাছে গর্ব করতো, সেই দেবতুল্য বড় ভাইয়ের অমত থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে চলে যাই কর্মস্থলে।

অফিসের পাশেই কলিগের সঙ্গে সাবলেট নিলাম। ছোটখাটো সংসার। খুব আনন্দেই কাটছিল আমাদের দাম্পত্য জীবন। ছুটির দিনে হই হুল্লোড় করে ছুটে বেড়াতাম এখানে–সেখানে। সে মা হতে চলেছে। তাই আমার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার জন্য তাকে একটি মোবাইল ফোন কিনে দিলাম। কিছুদিন পরই আমাদের সোনামণির আগমন ঘটবে। ভালোবাসার পাত্রটি কানায় কানায় পূর্ণ। তাকে কোনো কাজ করতে দিই না। রান্না–বান্না বন্ধ। দুপুরে পিয়ন দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিই। কিন্তু সে না খেয়ে আমার পথ চেয়ে বসে থাকে। বিকেলে অফিস শেষে রেস্তোরা থেকে খাবার এবং তার জন্য কিছু ফল নিয়ে বাসায় ফিরি। সে খেতে চায় না। তাকে জোর করে নিজ হাতে খাইয়ে দিই। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে শিয়রে বসে মাতৃগর্ভে আমার অনাগত বাচ্চার নড়াচড়া দেখি। কখনো কখনো সে ঘুম ভেঙে দেখে তার শিয়রে বসে আছি। তখন সে রাগ করে। এটি তার রাগ নয়, ভালোবাসা।

মাঝে মধ্যে সে বলে আচ্ছা, তুমি আমাকে এতো বেশি ভালোবাসো কেন?

আমি বলি, জানি না। তুমিও তো আমাকে কম ভালোবাসো না।

অবশেষে ১৯৯৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘর উজ্জ্বল করে আমার সোনামণির আগমন ঘটলো। আমাদের ভালোবাসার উপহার হাতে পেয়ে তার সে কি আনন্দ। মনে হয়েছিল সৃষ্টিকর্তা সব সুখ আমাদের ঘরে ঢেলে দিয়েছেন।

বললাম, সোনামণিকে একটু আমার কোলে দাও।

সে বললো, না, না তুমি তাকে নিতে পারবে না। আমার সোনামণি ব্যথা পাবে। এই বলে আরো সজোরে সোনামণিকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো।

কিন্তু বিধাতা সোনামণিকে রেখে তাকে কেড়ে নিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তিন দিন পর অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি আমার হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে মৃত্যুর কোলে পাষাণী আমাকে একা ফেলে চলে গেল।

প্রতি বছর ভালোবাসা দিবস আসে, ভালোবাসা দিবস চলে যায়। কিন্তু আমার ভালোবাসার ডাক বয়ে চলে অনন্তকাল আমার স্বর্গবাসী প্রিয়ার জন্য। সেই ডাক সে শুনতে পায় কি না জানি না। তবে তার রেখে যাওয়া ভালোবাসার উপহার যার নাম রেখেছি অর্পি, যার বয়স আজ ছয় বছর তার ডাক নিশ্চয়ই শুনতে পায়। সে এক তোড়া ফুল হাতে নিয়ে গত বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি গ্রেভ ইয়ার্ডে গিয়ে তার মায়ের কবরের পাশে দাড়িয়ে কেদে কেদে বলেছিল, মা, পাপা বলেছে, তুমি ফিরে আসবে, কবে আসবে?

আমার মামণির মুখে খৈয়ের মতো বুলি ফুটেছে। দৈনিক তার হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। শুধু বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখি আমার প্রিয়ার রেখে যাওয়া ভালোবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ সে উপহার।

এই ভালোবাসা দিবসে আমার সকল ভালোবাসা, আমার স্নেহাস্পদ মামণির জন্য। তাকে যেন একই সঙ্গে মায়ের ভালোবাসা ও পিতার ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মতো মানুষ করে তার প্রয়াত মায়ের আত্মাকে সান্ত্বনা দিতে পারি এই শক্তি, সাহস তুমি বিধাতা আমাকে দিও।

শুক্রাবাদ, ঢাকা থেকে

রসায়ন

– মোহাম্মদ আবছার উদ্দিন ফরায়েজী

ভালোবাসা শব্দটির ব্যাপ্তি অনেক বড়। সে অর্থে দুইজন নারী–পুরুষ একে অপরের প্রেমে পড়ে বা নৈকট্য কামনা করে এ আলোচনা ততোটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। *ভালোবাসা* বা *প্রেম* শব্দটি কতোই না মধুর, তাই না?

এই ভালোবাসা নিয়ে লেখালেখির শেষ নেই। শুরু যে কবে হয়েছিল তা ঐতিহাসিকেরা ভালো বলতে পারবেন। ভালোবাসা নিয়ে কতো গল্প, উপন্যাস, কতো কবিতা, কতো গান, কতো কিছুই না রচিত হলো। ভিন্ন আঙ্গিকে বিচার করলে আমরা, আমাদের চারদিকের পৃথিবী, একটি ভালোবাসার ফসল। কবিতা, গল্প, উপন্যাসে আমরা পড়েছি ভালোবাসা স্বর্গীয়, পবিত্র। ভালোবাসা স্বর্গীয় বা পবিত্র কি না

জানি না। তবে ভালোবাসা সম্পূর্ণ মনোদৈহিক ব্যাপার। নর–নারীর এক প্রকার আন্তঃমনো ও আন্তঃযৌন প্রকাশ এবং বিকাশ।

যে সমস্ত গ্রন্থির ক্ষরণ দেহের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ সে গ্রন্থিগুলোকে মনোবিজ্ঞানে বলা হয় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। এই অন্তঃক্ষরা বা নালীবিহীন গ্রন্থিগুলো দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াগুলোকে সুসংঘবদ্ধভাবে কাজ করায় এবং অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করায়। শরীরবিদরা ছয়টি অন্তঃক্ষরা বা নালীবিহীন গ্রন্থি শনাক্ত করেছেন।

যথা :

এক. পিটুইটারি গ্রন্থি

দুই. থাইরয়েড গ্রন্থি

তিন. প্যারা থাইরয়েড গ্রন্থি

চার. অ্যাড্‌নাল গ্রন্থি

পাচ. অগ্নাশয় গ্রন্থি এবং

ছয়. যৌন গ্রন্থি

শরীরে যে গ্রন্থিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাকেই বলে পিটুইটারি গ্রন্থি। এই গ্রন্থির অবস্থান মধ্য মস্তিষ্কে এবং আয়তন একটি মটর দানার মতো। এ পিটুইটারি গ্রন্থিই যৌন গ্রন্থির কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর মধ্যে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে মানব আচরণে এই জন্য এটাকে প্রভু গ্রন্থিও বলা হয়ে থাকে। যৌন গ্রন্থি থেকে যৌন হরমোর নিঃসৃত হয়। আবার যৌন হরমোন নিঃসৃত হয় পুরুষ দেহের অণ্ডকোষ ও নারী দেহের ডিম্বাশয় থেকে। পুরুষ ও নারীর যৌন হরমোনের মধ্যেও পার্থক্য আছে। পুরুষের যৌন হরমোনের নাম *টেস্টোসটরেন* আর নারীর যৌন হরমোনের নাম *ইস্ট্রোজেন।* এই হরমোনগুলোর প্রভাবেই পুরুষ দেহে পুরুষ সুলভ লক্ষণ। যেমন কণ্ঠস্বর মোটা হওয়া, দাড়ি–গোফ গজানো ইত্যাদি প্রকাশ পায় এবং নারী দেহে নানান নারী সুলভ লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর তখনই নারী, পুরুষ পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করে যাকে আমরা *ভালোবাসা* নামে অভিহিত করি।

আরেকটি জিনিস ভালোবাসায় কাজ করে থাকে তা হলো *প্রেষণা*। প্রেষণা মনোবিজ্ঞানের শব্দ। এর প্রতিশব্দ হিসেবে কাম্যতা, কামনা, লক্ষ্য, ইচ্ছা, অভিলাষ, উদ্দেশ্য, প্রয়োজন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। প্রেষণা বলতে সাধারণত মানুষ বা প্রাণীর আচরণের এমন একটি প্রকৃতিকে বোঝায় যা মানুষের অভাব অথবা প্রয়োজন বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং উদ্দেশ্য সাধনের দিকে পরিচালিত করে। মানুষ তার নিজের মধ্যে এই যে তাগিদ অনুভব করছে এ তাগিদই হচ্ছে প্রেষণা। প্রেষণার কারণেই মানুষ একজন আরেকজনকে কাছে পেতে চায়, হৃদয়ের সঙ্গে আপন করে নিতে চায়। তবে একে বাইরে থেকে দেখা বা অনুভব করা যায় না।

কলেজ রোড, ফেনী থেকে

সূচনা

– কবির

সেদিন বন্ধুর বাসা থেকে ফিরছি ট্রেনে। সহযাত্রী হয়ে পাশে বসলেন প্রায় সত্তর বছর বয়সের জাপানিজ এক বৃদ্ধা। হাতে গরম কফি।

ট্রেন ছাড়তেই গরম কফিতে চুমুক দিয়ে খুব নরম সুরে আমার দেশের নাম জানতে চাইলেন। পরে কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাবো ইত্যাদি সব প্রসঙ্গ নিয়ে বড় রকমের গল্প জুড়ে দিলেন। দূরের পথ বলে আমার ভালোই লাগছিল।

যখন গন্তব্যে নামার জন্যে উঠে দাড়িয়ে বিদায় অভিবাদন জানালাম তখন বৃদ্ধা মহিলা ছল ছল চোখে এক হাজার ইয়েনের একটি নোট হাতে গুজে দিয়ে বললেন, তোর মনটা খুব ভালো। বিয়ে করলে সুখী হবি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই ঘটনার সপ্তাহ খানেক পরেই টেলিফোনে পরিচয় ঘটে সূচনার সঙ্গে আমার। তারপর থেকে প্রায়ই ফোনে কথা হয়।

একদিন তার জীবনের চাওয়া কি জানতে চাইলে বলে উঠলো, খু–উ–ব সুন্দর একটা মন বহুদিন যাবৎ খুজছি, এখনো পাইনি।

বললাম, সেটা তো আমার কাছে। নিতে চাইলে নিতে পারো।

মিষ্টি হেসে ফোন কেটে দিল সূচনা।

জাপান থেকে

অসমাপ্ত

– রাশেদুল হাসান রাসেল

এ গল্পটি ভালোবাসা দিবস–এর গল্প হিসেবে মানানসই কি না তা নিয়ে নিজেরই বিস্তর সন্দেহ রয়েছে। সত্যিকার অর্থে এটি আদৌ ভালোবাসার গল্প কি না তা নিয়েই পাঠককুল প্রশ্ন করতে পারেন। তবে এটা কয়েকজন আবেগী মানুষের গল্প।

গল্পটির শুরু ৮০ দশকে। কোনো একটি ইউনিভার্সিটির সবুজ ক্যাম্পাস থেকে। গল্পটা এ রকম – ইউনিভার্সিটির একই ডিপার্টমেন্টের ছাত্র নূপুর, সজীব আর জাহেদ। পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ এবং অকৃত্রিম বন্ধু। পুরো ডিপার্টমেন্টেই তাদের বন্ধুত্ব একটা আলোচ্য বিষয়। তিনজনের কেউ আলাদাভাবে কিছু করেছে এ রকমটি কেউ দেখেনি, শোনেনিও। রাজনীতিটাও তারা একই সঙ্গে করতো। তারা তিনজনেই সরকার বিরোধী বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। এর মধ্যে নূপুর ও সজীবের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়াও প্রেমের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তবে কখনোই সেটা তিনজনের নির্মল বন্ধুত্বের মাঝে কাটা হয়ে দাড়ায়নি। নূপুর আর সজীব কখনোই জাহেদকে কাবাব মে হাড্ডি ভাবতো না, বরং টমাটো সস–ই ভাবতো। ভালোই চলছিল তাদের দিনকাল।

ছন্দপতন ঘটলো ৮০ দশকের কোনো এক জানুয়ারি মাসে। জাহেদ তখন দেশের বাড়ি রংপুরে। সজীবরা খবর পেল আগামী দুই এক দিনের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হলে অ্যাটাক করতে পারে। খবর পেয়ে সজীব দলীয় নির্দেশে নিজের রুমকে দুর্গ হিসেবে গড়ে তুললো। বামপন্থী হিসেবে তারা বিশ্বাস করতো, সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার বিপ্লব। তাই অবৈধ অস্ত্রকে তারা নীতিগতভাবে অসমর্থন করতো না। কিন্তু দুই দিন পরেও প্রতিপক্ষের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। বরং দ্বিতীয় দিন রাতে পুলিশ হল রেইড করলো এবং অবধারিতভাবে সজীব অস্ত্রসহ গ্রেফতার হলো। আসলে এটা ছিল একটা ফাদ যাতে ধরা দিয়েছে সজীবসহ আরো কয়েকজন। অস্ত্রসহ ধরা পড়ায় বিচারে সজীবের আট বছরের জেল হলো। গল্পের প্রথম পর্ব এখানেই শেষ। পাঠক একে একটি রাজনৈতিক গল্প বলতে পারেন।

দুই বছর পর। নূপুর ও জাহেদ তখন মাস্টার্স পড়ছে। প্রতি মাসেই তারা জেলে সজীবের সঙ্গে দেখা করে আসে। এর মধ্যেই নূপুরের ওপর বিয়ের জন্য চাপ আসে। বয়স তো কম হলো না। বাবা মায়ের চিন্তা তো হবেই। অবশ্য নূপুরের জন্য পাত্রের অভাব হয় না যদিও নূপুর কোনো না কোনো অজুহাতে প্রতিবারই এড়িয়ে যায়। কিন্তু এবার একটু শক্ত গ্যাড়াকলেই পড়লো নূপুর। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, সব দিক দিয়েই যোগ্যতর। সুতরাং বাবা মায়ের সাফ কথা, তোমার পছন্দের কেউ থাকলে বলো অথবা এ ছেলেকেই তোমার বিয়ে করতে হবে। এভাবে সারা জীবন চলতে পারে না।
নূপুর দিশেহারা হয়ে দেখা করলো সজীবের সঙ্গে। কিন্তু কেউই কোনো উপায় বের করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিটা বের হলো সজীবের মাথা থেকেই। নূপুর বিয়ে করবে। তবে বিয়ে করবে জাহেদকে। ইঞ্জিনিয়ারের হাত থেকে নূপুরকে বাচানোর এটাই একমাত্র উপায়। অবশ্য বিয়েটা প্রচলিত অর্থে বিয়ে হবে না। তারা শুধু সামাজিকভাবে স্বামী–স্ত্রী হিসেবে পরিচিত থাকবে। স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক তাদের মধ্যে থাকবে না। সজীব জেল থেকে ছাড়া পাবার আগ পর্যন্ত জাহেদ আগলে রাখবে নূপুরকে।
এতে বেকে বসলো জাহেদ। এটা কি ধরনের সমাধান? বিয়েটা তো কোনো ছেলেখেলা নয়। সজীব যখন সব উপায়েই বোঝাতে ব্যর্থ হলো তখন প্রয়োগ করলো শেষ অস্ত্র বন্ধু হিসেবে যখন সে জাহেদের কাছে জীবনের প্রথম এবং শেষ দাবিটা করে বসলো তখন জাহেদকে হার মানতেই হলো। কিছুদিন পর পারিবারিকভাবেই নূপুর ও জাহেদের বিয়ে হয়ে গেল। এ বিয়ের আসল মানে তিনজন ছাড়া অন্য কেউ জানলো না। গল্পের দ্বিতীয় পর্ব এ পর্যন্তই। পাঠক একে একটি বিরল বন্ধুত্বের গল্প বলতে পারেন।

তৃতীয় পর্বের শুরু আরো দুই বছর পর। সজীব তখন খুলনা জেলে। সঙ্গত কারণে যোগাযোগও একটু কম হচ্ছে। স্বামী–স্ত্রীর অভিনয় করতে করতে তখন নুপূর, জাহেদ দুজনেই ক্লান্ত। তাছাড়া এতোদিনেও সন্তান নিচ্ছেন না কেন – ইদানীং এ ধরনের কথাও বলা শুরু হচ্ছে। তাই জাহেদ ও নূপুর পরামর্শ করে দত্তক নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এবং এর প্রেক্ষিতেই নূপুর তার এক ডাক্তার বান্ধবীর মাধ্যমে সংগ্রহ করলো ছয় সাত দিনের এক শিশুকে পরবর্তী কালে আমরা যাকে আশা বলেই জানবো। সজীবকে

জানানো হলো আশার কথা। এ আশাই নূপুর জাহেদের একঘেয়ে জীবনে নিয়ে এলো বৈচিত্রের ছোয়া, আনন্দের পরশ। আশাকে নিয়ে দেখতে দেখতে কেটে গেল চারটি বছর। পাঠক একে একটি অদ্ভুত জীবনের গল্প বলতে পারেন।

গল্পের চতুর্থ পর্ব রচিত হলো সজীব জেল থেকে ছাড়া পাবার পর। হঠাৎ করেই সজীবের মনে সন্দেহ দেখা দিল নূপুর আর জাহেদেরই সন্তান আশা। ধীরে ধীরে সেটা বিশ্বাসে পরিণত হলো। শেষ পর্যন্ত সে বিশ্বাসই হারিয়ে ফেললো প্রিয়তমা প্রেমিকার ওপর থেকে। বিশ্বাস হারালো প্রাণপ্রিয় বন্ধুর ওপর থেকে। তারা যতোই বোঝানোর চেষ্টা করুক, সজীব তার বিশ্বাসে অটল। শেষ পর্যন্ত সে শর্ত জুড়ে দিল, আশাকে ত্যাগ করতে হবে। এই অসম্ভব হৃদয় ভাঙা শর্ত বন্ধুর সুখের জন্য জাহেদ মেনে নিলেও নূপুরের চিরন্তন মাতৃসত্তা তা কোনোভাবেই মেনে নিল না। এবং সজীবও তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলো না। গল্পের চতুর্থ পর্ব এখানেই শেষ। পাঠক ইচ্ছা করলে একে বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাসের গল্পও বলতে পারেন।

এই গল্পের শেষ পর্ব এখনো রচিত হয়নি। এখনো সজীব প্রতীক্ষায় আছে আশাকে ছেড়ে নূপুর তার ভালোবাসার পবিত্রতা প্রমাণ করবে। এখন নূপুর তার অবিশ্বাসী প্রেমিকের বিশ্বাস হারিয়ে আশার মাতৃত্বকে অবলম্বন করে বেচে আছে। এবং জাহেদ এখনো পরম বিশ্বাসের সঙ্গে আগলের রেখেছে বন্ধুর আমানত।
পাঠক, সত্যিকার অর্থে এটা কোনো ভালোবাসার গল্প নয়। আপনারা বরং একে ছেলেমানুষি আবেগের একটা মানবিক গল্প বলতে পারেন।

সিলেট থেকে

অভিনব শাস্তি

নতুন ভাড়াটে আসা মেয়েটির সঙ্গে প্রথমে ভালোলাগা, পরে ভালোবাসায় দুজন দুজনায় জড়িয়ে গেলাম। কিছু না বোঝার আগেই খবরটি লোকমুখে বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়লো। মানুষ মনে হয়, অতিরিক্ত রকমের আগ্রহ নিয়ে প্রেম ভালোবাসাজনিত কথাবার্তা বলতে এবং শুনতে ভালোবাসে। তার উপর আমি মাদ্রাসার ছাত্র। এ যেন রামের গীতের সঙ্গে রসের হাড়ি।
এভাবে এক কান, দুই কান করে ছড়াতে ছড়াতে ভাই-বোন, মায়ের কান পেরিয়ে বাবার কানে পৌছালো। তিনি খুব চমকালেন। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি দাড়িয়ে বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে চলে গেলেন তার পরামর্শগারে। বাবা অতিরিক্ত রকমের ধর্মে বিশ্বাসী। এক কথায় ধর্মান্ধ। তাই হয়তো সব বিষয়ে পরামর্শের জন্য বেছে নিয়েছেন মুনশি-মৌলভি, আলেম-ওলামাদের দরবার। পরামর্শগারের পরামর্শ ছাড়া এক চুলও নড়তে নারাজ। সে কারণেই হয়তো তার সবচেয়ে প্রিয় ছেলেটিকে উৎসর্গ করেছেন মাদ্রাসায়। অথচ তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির অনার্সের ডিগ্রিওয়ালা।

মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলেটি প্রেম জীবাণুঘটিত রোগে আক্রান্ত কথাটি আক্ষেপ করে পরামর্শগারে বলতে শুরু করেছেন। পুরো ঘটনা বলার পর তাদের কাছে সুপরামর্শ চান। অনেকক্ষণ যাবত পরামর্শ করে ফয়সালা হলো মাথা ন্যাড়া করাতে হবে। তাদের ধারণায়, প্রেম জীবাণুঘটিত রোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা এটি। কারণ হিসেবে মনে করে –

● ন্যাড়া মাথা মহিলারা, বিশেষ করে প্রেমিকারা অপছন্দ করে। তাছাড়া ন্যাড়া মাথা নিয়ে মেয়েদের সামনে যেতে অপমান বোধ করে।

● মনটা ছোট হয়ে যায়। যার ফলে আধ্যাত্মিকতা, ধার্মিকতা প্রবেশ করে পড়ায় মনোযোগিতাও বৃদ্ধি পায়।

● মনের মধ্যে খারাপ ধারণা উদয় হয় না। ইত্যাদি।

শাস্তিটা কিভাবে কার্যকর করা যায় তার উপর চললো আরো ঘণ্টাখানেক পরামর্শ। এসব লোকের মনে হয় অবসরই কাটে শলা–পরামর্শের ভেতর। এদের পরামর্শ শুনলে মনে হবে প্রাত্যহিক দিনের প্রধান কাজই যেন এটি। সবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, ভর্তির সময় ছাটখাটো লেবাস–এর অজুহাতে মাথা ন্যাড়ার কার্য সমাধা করা হবে। উল্লেখ্য, মাদ্রাসার ছাত্রদের ভর্তি করা হয় নতুন ছাত্রদের মতোই। পার্থক্য শুধু ফলাফলটা। একপক্ষের দেয়া থাকে, অন্যপক্ষের (নতুনদের) পরীক্ষা দিতে হয়।

সম্পূর্ণ ঘটনাই আমার অজানা। নিশ্চিত মনে যথাসময়ে মাদ্রাসায় উপস্থিত হই নতুন ক্লাসে ভর্তি হওয়ার জন্য। ভর্তির ফরম চাওয়াতে ওস্তাদজি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অপরাধী। ফরম দেবেন না। কারণ দর্শালেন আমার ছোটখাটো মাদ্রাসার উপযোগী না। ভর্তি হতে হলে মাথা কামিয়ে আসতে হবে।

আমি হতবাক। আমার থেকে লম্বা চুল নিয়ে অনেকেই ভর্তি হয়ে গেছে। এমন কিছু শ্রেণী আছে যারা সীমাহীন অন্যায় করলেও মুখ বুজে সয়ে নিতে হয়। এর মধ্যে একটা শ্রেণী হলো ওস্তাদ। আর সে জায়গায় মাদ্রাসার ওস্তাদ। এখানে তো কথাই নেই। বুঝতে পারছি না ভর্তির সঙ্গে মাথা কামানোর কি সম্পর্ক। আমার মাথার গঠন ভালো না। কামালে কি ভয়ংকর দেখা যাবে তা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে। এক সময় ওস্তাদের ধমকে আমার ভাবনায় ছেদ পড়লো।

যাও!

অগত্যা উঠে আসতে হলো।

পরদিন মাথার চুল খুব ছোট করে ছাটিয়ে বাবাকে সঙ্গে করে আনি এই ভেবে যে, বাবার সঙ্গে হুজুরদের একটা সম্পর্ক আছে। তিনি বললেই হুজুররা কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু আমার ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত হলো। ওস্তাদজি আমাকে দেখেই বিগড়ে গেলেন। পরামর্শগারে যে কয়জন হুজুর ছিলেন ইনি তাদের অন্যতম।

ওস্তাদ বললেন, তোমাকে বললাম, মাথা কামাতে, তুমি মাথা ছেটেছো কেন? বেয়াদবির একটা সীমা থাকা দরকার।

ঘরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। এ পরিস্থিতিতে বাবা বললেন, তোর মাথাই কামানো উচিত ছিল। মাথা কামানো সুন্নত, সওয়াবও বেশি। এই তথ্যটা তোর নিশ্চয়ই অজানা নয়। আচ্ছা, তুই ওস্তাদের আদেশ অমান্য করলি কেন?

আমার আগে তো অনেক ছাত্র... কথাটি পূর্ণ করতে দেননি। ধমক দিয়েই থামিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই। এক ছাত্রকে দিয়ে কাচি এনে এমনভাবে কেটে দিলেন যেন কামানো ছাড়া কোনো উপায়ান্তর না থাকে। শুধু কেটেই ক্ষান্ত হননি, সঙ্গে বাবার সামনে মন্তব্য তো আছেই। মন্তব্যের সীমাবদ্ধতা শুধু আমার মাঝেই রাখেননি, ছড়িয়ে দিলেন বাবার মাঝেও। বাবা ভাবলেশহীনভাবে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। এবং আমার চোখে অশ্রুসিক্ত জলধারা। এ রকম সংকটময় খারাপ মুহূর্ত আমার জীবনে আর ঘটেনি। মাথা কামালাম। ফরম নিলাম, ভর্তি হলাম।

ফেরার পথে লজ্জায় বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। বাড়ির কাছাকাছি এসে কি মনে করে বাবার মুখে তাকিয়ে তো আমি হতবাক। ওনার চোখে মুখে হাসির রেখা যেন কোনো রাজ্য জয় করে এই মাত্র বাড়ি ফিরলেন। আমার ধারণায় একজন মানুষের মেজাজের চরিত্র সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানা থাকে তার সন্তানের। আশ্চর্য হই, এতো বড় ঘটনা সহজভাবে নিলেন কিভাবে? অথচ তার চরিত্র তো এমন না!

সেদিনটা সব কিছুই ওলোট-পালোট লাগলো।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, এর কিছুদিন পর বাবা মারা যান। ভাগ্য ভালো, তিনি খুব গুছিয়ে এই ঘটনাকে ডায়রিতে পাতার পর পাতা লিখে রেখেছেন। তা না হলে সূক্ষ্ম সাজানো নাটকটি আমার আজীবন অজানার কাতারেই থেকে যেতো। বাবার ধারণায় এ রকম সুন্দর, নিখুত অভিনয় সার্থকভাবে তার ইহজীবনে আর একটিও করতে পারেননি। এবং এতেই তিনি নিশ্চিত ছিলেন ছেলের প্রেম জীবাণু ধ্বংস হয়ে গেছে।

অথচ তার আর কোনোদিন জানা হবে না যে, জীবাণুটা আজ সমস্ত শরীরে। ন্যাড়া মাথায় আমাদের দুইজনের ভালোবাসায় কোনো ফাটল ধরাতে পারেনি। আজও টিকে আছে।

কিছুদিন পর আমরা ভালোবাসার চিরবন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ থেকে

কেমন আছো ?

– রনী

সব সময় প্রতীক্ষায় থাকি সে আসবে। ডাকবে নাম ধরে। কিন্তু সে আসতো না। আমার আবীর হওয়ায় বাসায় আসতো। পরিবারের সকলের সঙ্গে কথা বলতো, হাসাহাসি করতো। আমি সামনে গেলেই সব বন্ধ। শুধু একটি কমন প্রশ্ন, কেমন আছো?

পাশে থাকলেও এড়িয়ে যেতো এমন ভান করতো যেন আমার অস্তিত্ব সে অনুভব করছে না। বিনা প্রয়োজনে সে আসতো না। কিন্তু পরিবারের অন্যদের জন্য সে আসতো। তার বড় সাপোর্ট ছিল আমার আম্মা। প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তার মতামতের প্রয়োজন ছিল।

পাশাপাশি থাকি তবু কোনো উৎসবে সে আমার সামনে এসে দাড়াতো না। প্রতিটি মুহূর্তে চাইতাম সে আসুক। সে স্বীকার করতো ভালোবাসি। কিন্তু কখনোই আমাকে বলতো না। আমিও লজ্জা ভেঙে তাকে বলতে পারতাম না।

এলাকার অনেকেই সন্দেহ করতো। তার ছোট ভাই আমাকে একা পেলেই ফাজলামো করে ভাবী বলে ডাকতো। শুধু সে বুঝতে চাইতো না। বুঝতো না কি কষ্টে রাতের পালকি আমি দিতাম বিদায়।

একদিন হঠাৎই তার পরিবার থেকে কথা ওঠে এবং সপ্তাহ না ঘুরতেই তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

বাসর রাতে ঢুকে তার প্রথম কথা ছিল, কেমন আছো?

আমি প্রচণ্ডভাবে চাচ্ছিলাম সে যেন ওই শব্দযুগল না উচ্চারণ করে। ওই শব্দগুলো ঘিরে ছিল আমার যতো ঘৃণা।

তাকে বললাম, এভাবে আমাকে এড়িয়ে চলতে কেন?

সে যা বললো তাতে আমি নির্বাক। তার বিশ্বাস ছিল আমি শুধু তারই।

আমি হাসবো না কাদবো, বুঝতেই পারছিলাম না। এতোটাই হতবাক আমি তার বিশ্বাসে।

রাজশাহী থেকে

চিরিং

– দিপু

শিবগঞ্জ ঘাটে দাড়ালেই দেখা যায় দুই তিন মাইল দূরে গারো পাহাড়ের ছোট ছোট টিলা। টিলার মাথায় মেঘ উড়তে দেখা যায়, বৃষ্টি ঝরতে দেখা যায়। মাঝে মধ্যে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায় পাহাড়ি গাছপালা। তখন কেমন যেন রহস্যময় মনে হয় সব কিছু। এবং যখন পাহাড়ে রোদ পড়ে, যখন মেঘ বৃষ্টির, ছোয়া থাকে না তখন দেখা যায় এর চোখ ঝলসানো রূপ। দূর থেকেও সব কিছু এমন স্বচ্ছ, এতো স্পষ্ট, এতো সজীব এবং এতো মায়াবী লাগে যে, মনে হয় সব কাজ ফেলে রেখে ওখানে চলে যাই।

প্রকৃতির এই তীব্র আকর্ষণ কে এড়াতে পারে? তাই প্রায়ই সাইকেল নিয়ে চলে যেতাম তার কোলে। ছোট ছোট টিলা। কোনো কোনো টিলার ওপর গারোদের তৈরি বাশের ঘর। কোনোটা আবার একেবারে বুনো। সহজে কারো পা পড়ে না। সব সময় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যেতাম। কয়েকটা ছোট ছোট টিলা পেরিয়ে দুটো বড় টিলা। এদের মাঝখান দিয়ে বের হয়ে এসেছে একটি ঝরনা। পায়ের গোড়ালি ভিজে এতোটুকু জল নিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদীর দিকে। সেই ঝরনার পাশেই বসে থাকতাম। কখনো একটু হাটতাম, কখনো বা এক মনে বই পড়তাম। আমি নির্জনতা পছন্দ করি আর জায়গাটা ছিল তাই।

এখানেই একদিন তার দেখা পাই। তার হাসির শব্দে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চমকে বই তুলে তাকাই। ঝরনার জলে দাড়িয়ে হাসছে একটি আদিবাসী কিশোরী। পরনে ব্লাউজ আর দকমান্দা

(কোমরে পেচিয়ে পরার লম্বা কাপড়)। সতেজ মুখটা জলে ভেজা। অপূর্ব সজীব তার সমস্ত শরীর। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

ঝরনার জল থেকে একটি নুড়ি তুলে ছুড়ে দিল আমার দিকে। হেসে বললো, তুমি এখানে প্রতিদিন কি করো?

কোনো রকমে বললাম, বই পড়ি।

এটা কি বই পড়ার জায়গা? বলে তীব্র হাসিতে ফেটে পড়লো মেয়েটি।

আমি মুগ্ধ, বিস্মিত। বললাম, তুমি এখানে কি করছো?

তোমাকে দেখতে এসেছি। দূরের একটি টিলার দিকে আঙুল তুলে বললো, ওইখানে আমাদের ঘর। তারপর ঝরনার জল থেকে উঠে আমার পাচ ছয় হাত দূরে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাড়ালো। আবার বললো, আমাদের ঘর থেকে তোমাকে প্রায়ই আসতে দেখি। তাই জানতে এলাম তুমি এখানে কি করো।

তোমার নাম কি?

একাকী চিরিং।

একাকী চিরিং! অদ্ভুত নাম তো! চিরিং মানে কি?

হাসলো সে।

আমি উঠে দাড়ালাম। প্রকৃতির মতো নির্মল তার হাসি। অকৃত্রিম সুন্দর। ঝরনার শব্দের সঙ্গে মিশে গেল তার হাসির ধ্বনি।

জলের দিকে তাকিয়ে বললো, চিরিং মানে পাহাড়ি ঝরনা।

সেদিন অনেক কথা হলো। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বিদায় চাইলো সে। আমার কাছে এসে চোখে চোখ রেখে কি যেন নিরীক্ষণ করলো, এবং বললো, তুমি খুব ভালো।

তার গালে আঙুল ছোয়ালাম। সে মুখ নিচু করে ফেললো। বললাম, আর তুমি খুব সুন্দর!

সে আবার তাকালো আমার দিকে। ফিক করে হেসে ফেললো। তারপর ঘুরে দাড়িয়ে এক দৌড়! ঝরনার পাড় দিয়ে দৌড়াতে লাগলো সেই টিলাটার দিকে যেখানে তাদের ঘর। দাড়িয়ে রইলাম এক জাদুর ঘোরে।

পরদিন আবার এলো সে। ফুল দিয়ে খোপা বেধেছে। চোখ, হাত নেড়ে নেড়ে কথা বললো আর হাসলো অনেক। এক সময় আমার হাত ধরে বললো, তুমিও খুব সুন্দর!

আমরা দ্রুত পছন্দ করে ফেলেছি একে অপরকে। আমরা দুই হাত ধরে ঝরনার জলে নেমে পড়লাম। ঝির ঝির করে পায়ের পাতা ভিজিয়ে জল যাচ্ছে। আমরা হাটলাম, কথা বললাম।

সূর্য অস্ত যাবার সময় হয়ে এলো। সে হঠাৎ আমার সামনে দাড়িয়ে গেল। দুই হাত বাড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরলো। চোখে চোখ রেখে গভীরভাবে বললো, *আংগে নাক্কো নামিনাক্কা।*

আমি তার কোমড় জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, বাংলায় বলো।

সে হেসে বললো, কালকে বলবো। তারপর আবার গতকালের মতো ভো দৌড়।

তাকিয়ে রইলাম যতোক্ষণ তাকে দেখা যায়।

বাক্যটির বাংলা জানি। সবচেয়ে মঙ্গলময়, সবচেয়ে প্রিয়, আমি তোমাকে ভালোবাসি। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ভাবলাম। বুঝলাম আমি প্রেমে পড়ে গেছি। বুঝলাম তার আকর্ষণ এড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

পরদিন অনেক কথা বুকের মধ্যে নিয়ে ওখানে গেলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সে এলো না। পরদিনও তাকে পাওয়া গেল না। চরম উৎকণ্ঠা, তৃষ্ণা নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করি দিনের পরদিন। সে আসে না, সে এলো না। এক সপ্তাহ, এক মাস, দুই মাস, চার মাস কেটে গেল, তার দেখা পেলাম না।

বুকের ভেতরটা শুকনো পাথরের মতো হয়ে গেছে। আশপাশে খোজ নিয়ে জানলাম এই নামের কোনো মেয়েকে তারা চেনে না। তারপরও বিভিন্ন মাধ্যম, বিভিন্নভাবে তার খোজ অব্যাহত রাখলাম। কিন্তু নয় বছর কেটে গেল, কোনো হদিশ পেলাম না সেই রহস্যময়ীর। মাঝে মধ্যে মনে হয় কি হলো আমার! তাকে ভুলতে পারি না। কিছুতেই ভুলতে পারি না।

প্রায়ই সেই জায়গাটাতে যাই। তাকে মনে করি। আমার ভালো লাগে। ঝির ঝির শব্দে পাহাড়ি ঝরনা বয়ে যায় একাকী। তাকে বলি, তুমি কি জানো, আমার বুকেও তোমার মতো একটি ঝরনা আছে? সেই একাকী পাহাড়ি ঝরনাকে কেউ দেখেনি আমি ছাড়া।

ঢাকা থেকে

না

– নজরুল ইসলাম বাবুল

তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা কলেজের করিডোরে। তারা দুইজন দাড়িয়েছিল। আড় চোখে একটু করে দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে এলাম। এরপর থেকে প্রতিদিনই ক্লাসের ফাকে তার দিকে তাকাতাম। তাকাতেই তার চোখে চোখ পড়তো। সেও আড় চোখে আমার দিকেই থাকাতো।

হঠাৎ একদিন কলেজ বাসে তার পাশে বসার সুযোগ হলো। তিনজনের সিটে বসেছিল তারা দুই বান্ধবী। আমাকে দেখেই একটু সরে গিয়ে সে জায়গা করে দিয়ে বসতে বললো। আমি বসলাম তার পাশে কিছুটা দ্বিধা আর সংকোচ নিয়ে। যতো দূর মনে পড়ে সেটাই ছিল কলেজ বাসে কোনো মেয়ের পাশে আমার প্রথম বসা। আমার আগের স্টেশন থেকে তারা উঠতো। উঠে তিনজনের ওই সিটটাতে গিয়েই তারা বসতো এবং তার পাশের সিটটাতে অন্য কাউকে বসতে দিতো না। চলতে চলতে এমন হলো যে, যদি কোনো সময় আমি কলেজ বাস মিস করতাম বা কোনো কারণে কলেজে না যেতাম তাহলেও তার পাশের সিটটাতে অন্য কেউ বসার জন্য এগোতো না।

আস্তে আস্তে তার পাশের সিটটা শুধু আমারই হয়ে গেল। এভাবেই শুরু হলো আমাদের এক সঙ্গে চলা। যেখানেই যাই, আমরা এক সঙ্গেই যাই। দিনের যেটুকু সময় আমরা বাইরে থাকি মোটামুটি এক সঙ্গেই কাটাই। নোট করা, সাজেশন করা, পাবলিক লাইব্রেরিতে যাওয়া সব টাইম মতোই হয়। তবে

প্রায়ই আমাকে আগে পৌছাতে হতো। মাঝে মধ্যে সে ইচ্ছা করে কলেজ বাসটা মিস করতো। তারপর হেটে হেটে রওনা দিতো। অগত্যা আমাকেও হাটতে হতো। মাঝপথে এসে আমার পীড়াপীড়িতে ট্যাকসিতে উঠতে হতো।

ট্যাকসিতে উঠতে গিয়েও আরেক ঝামেলা। এই ট্যাকসিটা ভালো না অথবা ড্রাইভারটা দেখতে ভালো না। এই ট্যাকসিতে উঠবো না, অন্য একটা ট্যাকসি খোজো। আরো সমস্যা হলো যে, পথ–ঘাটে কোথাও খাবার খাওয়া যাবে না, আমি খেতে চাইলেও না। তবে এই জীবনে তার থেকে যে শব্দটা সবচেয়ে বেশি শুনেছি সেটা হলো, না। এমন জোরে *না* শব্দটা বলতো, মেজাজটাই বিগড়ে যেতো।

সে বছর কলেজ থেকে আমরা পিকনিকের আয়োজন করলাম। সেখানেও তাদের না। তারা যাবে না। কারণ বাড়ি থেকে আগে কখনো কলেজ পিকনিকে যেতে দেয়নি। সেখানেও অগ্রভূমিকা পালন করলাম। আমিই তার মা বাবাকে বলে রাজি করালাম।

পিকনিকের দিন সকালে আমাকেই আনতে যেতে হলো। অবশ্য আমার অন্য বান্ধবীটি টিপ্পনি কেটে বলেছিল, কি রে, তুই এতো বড় ব্যাগ নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছিস নাকি। পিকনিকে গিয়েও আরেক ঝামেলা, তারা কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেবে না, ছবি তুলবে না, গাইবে না ইত্যাদি।

আমি একাই সব অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছি। আমার এখনো মনে পড়লে হাসি পায়। পিকনিকের অনুষ্ঠানে কালার অভিনয় করে প্রথম পুরস্কারটা আমিই পেয়েছিলাম। পিকনিক থেকে ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। তার বাবার সে কি রাগ, তখন আমি আমার ভিজা কাপড়–চোপড় তার ব্যাগে ফেলে চলে এসেছিলাম।

এমনি করে আমরা দুজন দুজনকে জানতে ও চিনতে লাগলাম এবং একে অন্যের ওপর নির্ভর করতে লাগলাম। তবে সে সব সময় থাকতো আলো–আধারের মাঝে। তাকে একটু বুঝি তো আবার কিছুই বুঝি না। এক সময় আমাদের মধ্যে এমন একটা মধুর সম্পর্ক হলো যা বলে বোঝাতে পারবো না। আমি একদিনের জন্য কোথা গেলে তাকে বলে যেতে হবে। যদি টাইমের বাইরে একদিনও বেশি হয় তাহলে তার কাছেও ঘেষা যাবে না। তার বেলায়ও একই নিয়ম।

প্রতিদিন আমাদের দেখা হতেই হবে। শুধু তার সঙ্গে দেখা করার জন্য কতো কি যে করেছি তার কোনো হিসাব নেই। এমনকি এক পথে ছয় সাতবারও হেটেছি।

একবার সংহতি দিবসের বন্ধের সময় সে বের হবে বলেছিল। শুধু তার সঙ্গে ঘোরার জন্য ১১০ কিলোমিটার পথ জার্নি করে গিয়ে সারাদিন তার সঙ্গে ঘুরে সন্ধ্যার সময় ফিরে এসেছিলাম। হয়তো রবিঠাকুর এ কারণেই বলেছিলেন, *আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না, ভালোবাসায় ভোলাবো।*

তার আরেকটা বাতিক ছিল সেটা হলো, ঘোরার বাতিক। না খেয়েও সারাদিন ঘুরতে পারতো। এভাবে প্রায় তিন বছর কেটে গেল। এর মধ্যে কখন যে আমার সব কিছু তাকে দিয়ে বসে আছি টেরই পেলাম না। তখন পর্যন্ত আমার মনের কথাটি তাকে বলা হয়ে ওঠেনি। একদিন সময় করে জানালাম আমার মনের কথাটি।

সুকৌশলে সে এড়িয়ে গেল। তবে আচরণে বোঝালো যে, সেও আমাকে ভালোবাসে। আরো কিছুদনি পর আমরা দুজনে বসেছি খুব নির্জনে। আমি তাকে বললাম, টুনি বলো তো আমার সোনার বাংলার পরের লাইনটা কি।

সে অসম্ভব রকমের সুন্দর করে আমার দিকে চাইলো।
তারপর *আমি তোমায় ভালোবাসি* বলে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।
তার পানে চেয়ে তার হাত দুইখানি সজোরে চেপে ধরে বললাম, আর তুমি না বলতে পারবে না।

রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম থেকে

যে চিঠি দেয়া হয়নি

লিসা,
কেমন আছো? বহুদিন তোমাকে দেখিনি। তবে কলেজে যাওয়ার পথে দুইবার দেখেছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় স্কুলে। তুমিই আমার প্রথম ভালোলাগা, ভালোবাসা। প্রথম প্রেম কি না তা জানি না। কারণ লোকে বলে প্রেম দুই তরফা হয়। তোমার আগে আমি কখনোই মেয়েদের দিকে তাকাতাম না, লজ্জা লাগতো।
কিন্তু ইংরেজি পরীক্ষার দিন তোমার সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগায় তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম, তুমি খুব সুন্দর করে হেসেছিল। ওই হাসি বিধাতা যাকে দিয়েছে তাকে ভালোবাসার অধিকার আমার আছে। তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছিলে, কাউকে পছন্দ করি কি না। অভিজ্ঞতা নেই। তাই বলে ফেলেছিলাম তোমাকে পছন্দ করি। তুমি যে আমাকে কখনোই পছন্দ করোনি তা বুঝতে পারতাম। তবে শেষের দিকে আমাকে ঘৃণা কেন করতে তা বুঝতে পারতাম না। আজ বুঝি। আসলে সেই বয়সে তোমার রিজেকশন মেনে নিতে পারিনি। তাই আমার খুব কাছের বন্ধুরা (!) যা বলতো তাই করতাম। খুব ইচ্ছা করে তোমার সামনে দাড়িয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাই। জানি তুমি কখনোই আমার সামনে আসবে না। আজও মনে পড়ে, কতো বাহানায় তোমার কাছে ফোন করতাম। তোমার কণ্ঠস্বর আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজতো। গ্রেহাম বেল তুমি ধন্য।
তুমি খুবই সুন্দরী। তাই প্রতিদিন দুই চারটা অফার পাওয়া তোমার জন্য কোনো ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া তোমাকে জীবন দিয়ে ভালোবাসবে এমন ছেলের সংখ্যাও কম নয়। সমরেশ মজুমদার ঠিকই বলেছেন, *নদীর খুব কাছের লোকেরা পানির মর্ম বোঝে না, মরুভূমির লোকেরা বোঝে।*
যাহোক, আমার মতে, আমার জীবনে তুমি ছিলে পরশপাথর। আজ আমি যা তা তোমার সঙ্গে দেখা না হলে কখনোই হতো না। আমি ছিলাম খুব উচু দরের নিচু মানের বলদ। তুমি যেন আমাকে পছন্দ করো এ জন্য নিজেকে ঢেলে সাজিয়েছিলাম। তোমার রিজেকশন তো ভেঙেও গিয়েছিল। কিন্তু এখন তা অনেক মজবুত। খুব ইচ্ছা করে তোমার একটা ছবি আকতে। দুই বছর চেষ্টা করেও পারিনি।
যদি কখনো পারো, মাফ করে দিও। শুধু একটা জিনিস কামনা করি, যেখানেই থাকো, সুখে থেকো, পৃথিবীর কোনো দুঃখই যেন তোমাকে ছুতে না পারে, ঠিক যেমনভাবে আমি তোমাকে রাখতে চেয়েছিলাম।
নাম : তা তো তোমার জানা।
ঠিকানা : তোমার অন্তর।

অ্যাডভেঞ্চার অফ ফাকা বাড়ি

১৩ ডিসেম্বর ২০০১। এদিনটিকে মনে রাখার মতো আপনাদের দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত. ওই দিন ২৭ রোযা ছিল। দ্বিতীয়ত. ওই দিন ভারতের পার্লামেন্টে সন্ত্রাসীদের আক্রমণে তেরোজনের প্রাণহানি ঘটেছিল। কিন্তু এসব কারণে দিনটিকে মনে রাখিনি। এদিনের কিছু স্মৃতি আছে যা আমার জীবনের অন্য রকম অভিজ্ঞতা।

আগের দিন রাত থেকেই মনে হচ্ছিল পরদিন সোনাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে। প্রাইভেট পড়ার কথা বলে গেলাম তার ভাবীর বাসায়। ভয়ে, আনন্দে মনটা কেমন জানি করছিল।

ভাবী বললেন, রাতে ঘুম হয়নি, না? ওদিকে তোমার ইয়েও ঘুমাতে পারেনি।

বুঝতে পারলাম সোনাবাবুর কথা বলছে। কি যে ভালো লাগছিল তা বোঝাতে পারবো না। শুনলাম গতকাল এসেছে। কোনো এক বন্ধুর বাড়িতে নাকি উঠেছে। বলে রাখা ভালো, সে পড়ে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে এবং আমি স্থানীয় একটি কলেজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাবীর বাসায় আসবে জেনে অপেক্ষার প্রহর গুণতে লাগলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়ার মাঝে আলাদা একটা ভালোলাগার অনুভূতি কাজ করে বুঝতে পারলাম। আসলে আমরা কেউই জানতাম না আজ এভাবে দেখা হয়ে যাবে। শুধুই মন বলছিল, আজ কিছু হতে চলেছে। মাঝে মধ্যে মনের কথাও শুনতে হয়।

সে এলো আধা ঘণ্টা পর। লজ্জা করছিল আবার শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল যেন বুকের ভেতর। সে যখন আমার হাত ধরলো মনে হলো এ হাতে হাত রেখে নির্ভয়ে পথ চলা যায়। এটা প্রথম হাত ধরা নয়। আসলে দুই মাস নয় দিন পর দেখা তো, তাই কেমন জানি নতুন নতুন লাগছিল।

সোনাবাবু বললো, আমার এক বন্ধুর বাসায় যাই চলো। বাসায় তার বাবা-মা কেউ নেই।

আমি রাজি হইনি প্রথমে। কারণ এ সম্পর্কে যাযাদিতে কিংবা মানুষের মুখে অনেক ঘটনা পড়েছি বা শুনেছি। তাই এ ব্যাপারটিকে সব সময় এড়িয়ে চলতাম। সে কখনো তাই জোর করতো না। কিন্তু সেদিন যে কি হলো!

সে বললো আমার সঙ্গে নাকি অনেক কথা আছে যা এখানে বলা যাবে না। তাছাড়া এতোদিন পর দেখা হলো, এখন যদি তার এই একটা অনুরোধ না রাখি তাহলে ভীষণ মন খারাপ করবে।

বেশ কিছু কথার পর আমি রাজি হলাম।

আসলে আমার ভেতরে যে আরেকটি আমি আছে সে আমাকে বলছিল, যা না, গিয়ে দেখ, তোর নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে। আসলে কোনো ফাকা বাড়িতে আমরা কখনোই গল্প করিনি বা দেখা করিনি। আর আমার মনে হচ্ছিল, আজ আমাদের দুজনের একটা পরীক্ষা হয়ে যাক।

রাজি হলাম। রিকশায় উঠলাম। ভয় করছিল।

পরিচিত কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলে অ্যাডভেঞ্চার অফ ফাকা বাড়ির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবো না। রিকশায় উঠে আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়ার মতো অনেক কথা সে বলছিল। আমি হাসছিলাম। কারণ সোনাবাবুর প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

কেমন যেন সংকোচ লাগছিল। তবুও ভেতরে ঢুকলাম। তার দুজন বন্ধু ছিল। তাদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প ইয়ার্কির এক পর্যায়ে তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে সোনা দরজা আটকে দিল। ঘরে তখন শুধু আমরা দুজন। দুজন খাটের দুই প্রান্তে বসেছিলাম।

সে বললো, কাছে এসে বসো।

গেলাম না।

তারপর আবার...।

পরে যখন আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমারই লেখা ডায়রি পড়তে শুরু করলো তখন গেলাম।

হাত ধরে গল্প করছিল। তার গল্প শুনতে খুব ভালো লাগে। ভেতরে ভেতরে নার্ভাস হয়ে পড়ছিলাম। এক সময় সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

আমি বিদ্যুৎ গতিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর বেশ কিছুক্ষণ পর আবারও...। ততোক্ষণে যেন কেমন হয়ে গেছি। এরপর সে যখন আবার আমায় জড়িয়েছিল তখন নিজেকে ছাড়ানোর মতো শক্তি আর সঞ্চয় করতে পারিনি।

আমি যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়লাম। মনে হলো, দুর্বল কোনো স্বর্ণলতা শক্ত বৃক্ষকে জড়িয়ে বেচে থাকার চেষ্টা করছে। আমার সমস্ত শক্তি যেন কেউ কেড়ে নিল। ভালোবাসার মানুষকে জড়িয়ে ধরলে এতো ভালো যে লাগে তা আগে বুঝিনি। কেমন জানি মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। ভালোলাগার আবেশে শরীরটা যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল সারাটা জীবন যদি এভাবে থাকা যেতো!

এক সময় ঘর থেকে বের হলাম। সত্যি বলতে কি, আমার মোটেও ইচ্ছে করছিল না সোনাবাবুকে ছেড়ে বাসায় চলে আসতে। ঘর থেকে বের হওয়ার পর আমার খুব লজ্জা করছিল। তার বন্ধুরা হয়তো অনেক কিছু ভেবে বসে আছে। বাসায় এলাম ভয়ে ভয়ে। এই বুঝি কেউ কিছু বুঝে ফেলে। অনুশোচনা হচ্ছিল খুব। সারাক্ষণই মনে হচ্ছিল আমি বুঝি তাকে জড়িয়ে আছি।

এদিনটি আমার অন্য রকম একটা দিন এ কারণে যে, এই প্রথম তাকে এতো কাছে পেয়েছি। নিজের ইচ্ছায় তো। আনলাকি থারটিন আমাকে সুন্দর কিছু উপহার দিয়েছে। সোনাবাবু খুব ভালো বলেই আমাকে কুৎসিত কোনো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাই অ্যাডভেঞ্চার অফ ফাকা বাড়ির অভিজ্ঞতা আমার কাছে খুব মধুর, খুব নির্মল, খুব আনন্দের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বগুড়া থেকে

ভিন্নধর্মী

– রহমান মণি

ভালোবাসা (Love) শব্দটি প্রথম শুরু হয়েছিল কবে থেকে সে কথা কোনো ইতিহাসবিদ তার গবেষণায় বের করতে না পারলেও ঐতিহাসিক ভালোবাসার কিছু উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তবে তাদের উদাহরণগুলো কেবলই কপোত–কপোতী বা নরনারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন লাইলি–মজনু, শিরি–ফরহাদ কিংবা চণ্ডিদাস–রজকিনী।

কিন্তু তার বাইরেও যে অনেক অকৃত্রিম ভালোবাসা বা গভীর প্রেম থাকতে পারে সেটা আর উদাহরণ হিসেবে ইতিহাসবিদদের লেখায় স্থান পায় না দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মায়ের প্রতি ভালোবাসা বা মায়ের ডাকে সাড়া দেয়া।

এছাড়াও ভালোবাসা হতে পারে পোষা প্রাণীর প্রতি, সন্তানের প্রতি, পিতা–মাতার প্রতি, পছন্দনীয় জিনিসের প্রতি, মাতৃভূমির প্রতি।

এ সব ভালোবাসার ভেতর কিছু ভালোবাসা আছে যা কেবলই লোক দেখানো, অনেকটা দৃষ্টিকটু। তেমনি একটি দৃষ্টি নিন্দিত ভালোবাসার কথা আমরা জানতে পেরেছি যাযাদির ১৯ বর্ষ ০৮ সংখ্যায়। রংপুরে জনৈক ভদ্রলোকের আদুরে (?) কন্যার পোষা ছাগলের জন্মদিনে ঢাকঢোল পিটিয়ে, গরু, খাসি জবাই করে ভূরিভোজ করানো।

শখ মানুষের থাকতেই পারে। মানুষের বিচিত্র রকম শখ–এর শেষ নেই, নেই কোনো সীমাবদ্ধতা। তাই বলে যে দেশে মানুষের জন্মদিনের আব্রু ঢাকার পর্যাপ্ত সামর্থ নেই, যে দেশের মানুষ যাকাতের একটি কাপড়র জন্য পদদলিত হয়ে প্রাণ হারিয়ে কাফনের কাপড় নিয়ে চিরবিদায় হয়, (সম্প্রতি গাইবান্ধায় যাকাতের কাপড় আনতে গিয়ে প্রায় অর্ধশতাদিক লোকের প্রাণহানি ঘটে)। যে দেশে ঈদে একটি নতুন কাপড়ের আবদার পূরণ করার ক্ষমতা না থাকায় কিংবা আবদার পূরণ না হওয়ায় উভয় ক্ষেত্রেই আত্মহননের পথ বেছে নেয় সেই দেশে ছাগলের জন্মদিনে ঘটা করে ভূরিভোজের মাধ্যমে পালন করা কতোটা যুক্তিযুক্ত?

আজ একটি অন্য রকম ভালোবাসা, অন্য রকম অনুভূতির কথা জানাতে চাই যাযাদির পাঠকবৃন্দকে যা আমার জীবনে নিত্যনতুন অহরহ ঘটছে।

আমার দুইটি সন্তান নিয়ে জাপানে ব্যাচেলর জীবন যাপন করছি। আমার মেয়ের বয়স দশ বছর এবং ছেলের বয়স সাত বছর। তাদের মায়ের সঙ্গে দীর্ঘ পাচ বছর আগে আমার, আমাদের সম্পর্কচ্ছেদ হয়। যখন তাদের বয়স ছিল যথাক্রমে পাচ এবং দুই সেই থেকে তারা আমার সঙ্গেই।

অবাক লাগার কথা হলো, তারা দুজনেই সেই থেকে ভুলেও একটিবারের জন্যও তার জন্মদাত্রী ময়ের কথা বলে না। কেউ জিজ্ঞাসা করলেও এড়িয়ে যায়। এমনকি গভীর ঘুমেও নিজের অজান্তে অথবা টয়লেটের বেগ চাপলেও আব্বু ছাড়া কোনোদিন আম্মু ডাক শুনিনি।

এবার আমার মেয়ের কিছু কিছু ব্যতিক্রম ধর্মী ভালোবাসার (আমার প্রতি) কথা লিখবো যা সাধারণত এই বয়সের বাচ্চাদের কাছ থেকে, বিশেষ করে উন্নত দেশের বাচ্চাদের থেকে যেটা আশা করা যায় না।

২০০০ সালে আমার মায়ের মৃত্যু হয়। সে খবর বাংলাদেশ থেকে আমার বড় ভাই টেলিফোনের মাধ্যমে জানান। আমি বাসায় না থাকাতে ফোন ধরে আমার মেয়ে ইফা। আমি ফিরে এলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমি তোমার মা (আমি তাকে আদর করে বুড়িমা বলে ডাকতাম) তাই না? আমি সম্মতি জানালে তখন বলে যে, জানি তোমার মন খারাপ হবে। তবুও বলতে হচ্ছে যে, দাদুমণি মারা

গেছেন। বাবা ফোন করেছিলেন (আমার বড় ভাইকে বাবা বলে ডাকে)। তুমি মন খারাপ করো না। আমিও তো তোমার বুড়িমা। এখন থেকে আমি দুই মায়ের কাজ করবো।

সেই থেকে মায়ের অভাব যাতে অনুভব করতে না পারি তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে নিরলসভাবে।

আমি যখন রান্না করতে গিয়ে ঘেমে যাই তখন পেছন থেকে বাতাস করে আর বলে, আমার ছেলেটা সারাদিন কতো কাজ করে হয়রান হয়ে যায়, আরেকটু তারপর আর কোনো কষ্ট করতে হবে না ইত্যাদি। তার দেয়া বাতাস লেগে চুলার আগুন নষ্ট হয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে বলার মতো কিছু থাকে না।

রাতে ঘুম আসলে বার বার উঠে আমার ব্ল্যাংকেট ঠিক আছে কি না সেই দিকে খেয়াল রাখবে। ঘুমের আগে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে।

বাসা থেকে বের হওয়ার সময় গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ঠিক আছে কি না, ঘর লক করা হয়েছে কি না আরেকবার চেক করার পর তবেই না বের হবে। সব কিছুতেই নজরদারি করা আমার মেয়ের নিত্যদিনের রুটিন। যদিও মাঝে মধ্যে আমার অনুপস্থিতিতে নিজেই ভুলে যায় সে তবুও আমি বের হওয়ার সময় মঙ্গল কামনা করা, রাস্তা–ঘাটে চলাফেরার সময় বার বার সাবধান করে দেয়াতে কেবল জন্মদাত্রী মায়ের কথাই মনে পড়ে। আমার মায়ের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পাই বুড়িমার মুখে।

বিভিন্ন দিবসে যেমন জন্মদিন, পিতৃ দিবস, মাতৃ দিবস, ভালোবাসা দিবসে নিজ হাতে বানানো উপহার যখন আমার বুড়িমার কাছ থেকে পাই তখন নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে হয়। কিন্তু অনেক সময় ভাবতেও অবাক লাগে, কিভাবে এগুলো তাদের মাথায় থাকে। হয়তো আহামরি কিছু নয়। কিন্তু আমার কাছে তা অমূল্য সম্পদ।

শীত বেশি বলে উল দিয়ে মাফলার বানিয়ে দিয়েছে তার সাত বছর বয়সে আমার জন্মদিনে। বাংলাদেশে কলেজ পড়ুয়া মেয়ের মাথায়ও হয়তো এই রকম আইডিয়া আসবে না।

আমার সন্তানদের আইডিয়া, জাপানিজ স্কুলের শিক্ষার মান, শিক্ষা কার্যক্রম এবং নিজের ছেলেবেলার স্কুলের কথা মনে হলে নিজেই নিজের কাছে লজ্জা পাই।

গ্যাস বন্ধ না করে বাইরে যাওয়া যাবে না, পানির অপচয় করা যাবে না, রাস্তায় ময়লা ফেলা নিষেধ, বিদ্যুৎ জাতীয় সম্পদ, পশুদেরও বাচার অধিকার আছে এসব জাপানিজদের প্রথম শ্রেণী থেকেই শিক্ষা দেয়া হয়, সেই সঙ্গে হাতের কাজও। তাই তাদের মাথায় এই রকম আইডিয়া ঘুরপাক খায়।

সবচেয়ে বেশি সেবা–যত্ন পাওয়া যায় যদি বিরক্ত হয়ে বলি যে, আমার শরীরটা ভালো নেই। তখনই আরম্ভ হয়ে যায় দুই ভাইবোনের খেদমত। রীতিমতো প্রতিযোগিতা। একজন মাথা টিপে দিলে অন্যজন হাত পা টিপবে। আমিও খুব এনজয় করি। মনে মনে পুলকিত হই।

আমার কাছে মনে হয়, এ এক অন্য রকম অনুভূতি যা কাগজ–কলমের ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ অনুভূতির কথা, অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা কেবল হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। শিশুদের ভালোবাসা কোনো লোক দেখানো নয়। তাদের ভালোবাসা অকৃত্রিম, হৃদয় নিংড়ানো, অন্তরের অন্তস্থল থেকে নিঃসৃত।

সাম্প্রতিক সময়ে আমার বুড়িমা আবার নতুন বেশ ধরেছে। যতোক্ষণ বাসায় থাকে সারাক্ষণই একটি এপ্রোন শরীরে জড়িয়ে রাখবে। শোয়ার সময় বালিশের কাছেই রাখে যাতে সকালে ভুল না হয়। এতে নাকি বুড়িমার ভাবটা সম্পূর্ণ অনুভূত হয়। বলাবাহুল্য, জাপানি বৃদ্ধারা সব সময়ের জন্য শরীরে একটি এপ্রোন জড়িয়ে রাখে।

টোকিও থেকে

পরচুলা

– মেহের আমজাদ

আনন্দে আমার তা ধেই, তা ধেই করে নাচতে ইচ্ছা করছে। আর করবেই বা না কেন। বৌ তো নয় যেন বিশ্ব সুন্দরী। ঘটক মশাই–এর ক্ষমতা আছে এ কথা স্বীকার করতে হয় বৈকি। কথা মতো ঘটক মশাইকে বখশিস তো দিতেই হয়। সেই সঙ্গে আর কিছু উপঢৌকনও দিয়ে দিলাম।

বিয়ের আগে যৌবন বয়সে বেশ কয়েকজন জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখিয়েছিলাম। তারা বলেছিল, প্রেম–ট্রেম নাকি আমার ভাগ্যে নেই। আর যদি কোনো প্রেমিকা জুটেও যায় তাহলে ফুড়ুৎ করে নাকি উড়ে পালিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, ছ্যাকামাইসিন খেয়ে আমাকে দেবদাস অথবা মজনুর মতো ঘুরে বেড়াতেও হতে পারে। তাই তো প্রেমের অফার কাউকে দিইনি। এবং ওসব ঝক্কি–ঝামেলাতেও জড়াইনি।

চেহারা–সুরত আমার যাই থাক, যৌবনে যে দুই একটা প্রেমিকা আমার আশপাশে ঘুর ঘুর করেনি তা কি হলফ করে বলতে পারি? দুই একটা প্রেমিকা আমাকে প্রেমের অফার দিলেও সে পথে পা বাড়াইনি। কারণ ওই জ্যোতিষী।

তবে ঘটক মশাই যে সুন্দরী কন্যা বেছে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে তাতে ধন্য না হয়ে কি পারি! আমার কপালে এমন বৌ পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমার এমন টেকো মাথায় পাত্রী হিসেবে যে কোনো সুন্দরী কন্যার বাবা মা নিশ্চয় আপত্তি তুলবে। কিন্তু ঘটনাকে ঘটিয়েই ছাড়লো ঘটক মশাই।

আমি যাকে বলে বংশগত টেকো। বাইশ পার না হতেই চুল পড়া শুরু করলো। তখন থেকেই মহাদুঃশ্চিন্তায় ভুগছি চুল নিয়ে। কতো কবিরাজ, ডাক্তার দেখিয়েও কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত আমার বয়স পচিশে ঠেকতে ঠেকতে দিব্যি স্টেডিয়াম মাঠ হয়ে পড়লো।

আমার অবশ্য একটা গোপন আশা ছিল। তা হলো, আমার যে বৌ হবে অবশ্যই তাকে সুন্দরী হতে হবে। কিন্তু যখন আমার এই টেকো অবস্থা এবং মাথা হয়ে গেছে স্টেডিয়াম মাঠ তখন ভেবেছিলাম চিরকুমার হয়েই থাকবো। বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে হিসেবে তাদের বংশ রক্ষার্থে তা আর হতে দেয়নি।

ঘটক মশাই যখন পাত্রী দেখতে শুরু করেছেন তখন বলেছিলাম, দেখুন ঘটক মশাই, আপনি যতোই পাত্রী দেখে বেড়ান আর বাবা–মা যতোই উঠেপড়ে লাগুক আমি বিয়ে করছি না।

আমার কথা শুনে ঘটক মশাইয়ের তো *আক্কেল গুড়ুম* হওয়ার মতো অবস্থা। তিনি জানতে চাইলেন প্রকৃত ঘটনা এবং আমার বিয়ে না করার পেছনের রহস্য।

বললাম, তেমন কোনো রহস্য বা ঘটনা আমার জীবনে নেই। তবে অনেক কিছুই ভাবনার আছে। এই যে আমাকে দেখছেন, টেকো মাথায় কোনো সুন্দরী কন্যার পিতা তার কন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইবেন? তাদেরও তো মন আছে, পছন্দ বলে একটা বিষয় আছে। আর জেনেশুনে আপনি অযথাই গলদঘর্ম হচ্ছেন এটা আমার মোটেও ভালো লাগছে না। বিয়ে যদি করতেই হয় অবশ্যই তাকে সুন্দরী হতে হবে।

ঘটক মশাই তখন আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, বাবাজি, তুমি কথাটা একেবারে মন্দ বলোনি। তবে উপায় আছে। তুমি রাজি থাকলে তোমার পছন্দ মতো সুন্দরী কন্যার ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।

আমি তখন আনন্দে না নেচে পারি! বললাম, তাহলে দেখতে থাকুন। আর আমার পক্ষ থেকেও বখশিস থাকবে।

কয়েকদিন বাদে ঘটক মশাই এসে বেশ খোশ মেজাজেই আমাকে বললেন, বাবাজি, একটা সুন্দরী মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। মেয়ের বাপ-চাচারা তোমাকে দেখতে আসবে, আর এই নাও পরচুলাটা, মেয়েপক্ষের লোকজন যখন তোমাকে দেখতে আসবে তখন বাবাজি কি করতে হবে তা নিশ্চয় বুঝে ফেলেছো। এই বলে ঘটক মশাই আনন্দে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গেলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে কন্যাপক্ষের লোকজন এসে আমাকে দেখে, আমাদের বিষয়ে আমাদের খোজখবর নিয়ে বিয়ের দিন পাকা করে ফেললো। অতঃপর বিয়ের শানাই বেজে ওঠলো। তারপর বৌ বাড়িতে এলো। মা বাবা তো খুশিতে আটখানা।

এরপর গেলাম অষ্টমঙ্গলাতে, পরচুলা তো সঙ্গেই আছে। ধরা পড়ার ভয়ে টেকো মাথা থেকে পরচুলা খুলেও রাখতে পারছি না। ঘটক মশাই যদিও বলে দিয়েছেন দুই এক মাস ঘর সংসার করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ নিয়ে আর তেমন কিছুই হবে না। কিন্তু এ কয়েকদিনে যে, চব্বিশ ঘণ্টা পরচুলা মাথায় রেখে আমি অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগেছি।

যাই হোক। শ্বশুরবাড়িতে বেশ ভালোই কাটছিল। কিন্তু অষ্টমঙ্গলা শেষে বৌকে নিয়ে বাড়ি ফেরার আগের রাতে যে এমন ঘটনা ঘটবে তা কে জানতো?

আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে দুইজনে খাটে শুয়ে আছি। কোথায় থেকে যে একটা বিড়াল ঝপ করে পড়বি তো পড় ওর গায়ে। ও দিশে না পেয়ে ঘুমের ঘোরে কোনো জায়গা পেল না। আমার টেকো মাথার পরচুলা চেপে ধরতেই তার হাতের মুঠোয়। ও তখন ভূত ভূত করে সারা বাড়ি মাথায় করে চেচিয়ে উঠলো।

আমার তখন এমন পরিস্থিতিতে লজ্জায় মুখ দেখানোই দায় হয়ে উঠলো। চলে এলাম বাড়ি। তারপর অনেক খোজখবর নিয়েও কোনো কাজ হয়নি।

পরে বুঝলাম বৌ আর এ বাড়ি আসবে না।

মেহেরপুর, থেকে

দিয়া সমাচার

দিয়াদ্বয়

আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কালারফুল দিয়া সমাচারে। প্রথমে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ পাঠিকাদের বৈশিষ্ট্য আমরা দুজনই দিয়া। আমরা দারুণ উচ্ছল, হাসি-খুশি, চঞ্চল, সাহসী। তবে উগ্র নই। বন্ধুদের কাছে মিশুক এবং ননস্টপ লাফিং গার্লস হিসেবে পরিচিত। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ আমাদের খুব প্রিয়। মাঝে মধ্যে ইচ্ছা হয় আকাশের বিশালতাকে জয় করতে আবার কখনো ইচ্ছা হয় সুন্দর চাদটাকে ছুয়ে দেখতে।

কিন্তু পরমূহূর্তেই ইচ্ছা হয় সুনীল সাগরের পানিতে পা ভেজাতে। ইচ্ছা হয়, পৃথিবীর সুন্দরতম স্থানগুলোতে হেটে বেড়াই প্রিয় মানুষের হাত ধরে। স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তবে সীমা লঙ্ঘনে নয়। প্রচলিত ধারার প্রেম, ভালোবাসা কখনো আমাদের আকর্ষণ করেনি। কেননা বাবা-মাকে আমরা প্রচণ্ড ভালোবাসি। আর আমরা... দিয়াদ্বয় খুব ভালো বন্ধু। এবার আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে।

পর্ব এক

মনটা ছিল খারাপ। কলেজ বন্ধ। তাই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা নেই, মজাও নেই। হঠাৎ কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। সৌভাগ্যক্রমে হাতের কাছে মোবাইলও ছিল। তাই ড. সৌমিকের নাম্বারে মিসকল দিই। এর মাঝে দুজনে ঠিক করি ওনাকে বোকা বানাবো। পরিচিত মানুষেরা বলেন, ফোনে নাকি আমাদের কণ্ঠস্বরে মিল রয়েছে।

তিনি রিং ব্যাক করলেন। কথা শুরু করলাম। নাকি বোকা বানানো শুরু করলাম! অবশেষে তাকে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে, মোবাইলটা আমরা কয়েকদিন আগে কিনেছি।

এবার তিনি জানতে চাইলেন আমাদের পরিচয়।

উত্তরে জানালাম দিয়া।

এখানে বলা উচিত যে, ফোনটা আমাদের মাঝে কয়েকবার চেঞ্জ হয়েছে। কিন্তু তিনি আর সবার মতোই বুঝতে পারেননি। সে রাতে তিনি জানিয়েছিলেন, এমন একটা রহস্যভরা ফোনের অপেক্ষায় ছিলেন। এটা তার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে এবং তিনি বন্ধু হওয়ার অফার দেন।

তার গল্প যেন আর শেষ হয় না। হঠাৎ করে লাইনটা কেটে গেল। ঘড়ির কাটা দুইটার প্রান্তে। এবার দুজনে ঠিক করলাম আমাদের আসল পরিচয় জানাবো।

ফোন করলাম এবং প্রথমেই সরি বলে তাকে আসল পরিচয় জানালাম। কথাটা শোনার পর তার অবস্থা হলো শেখ হাসিনার নির্বাচনের পরাজয়ের মতো! কেননা এতোটা বোকা তাকে সম্ভবত এর আগে কেউ বানায়নি। আর আমরা...।

পর্ব দুই

পরিচিত নাম্বারে ফোন করতে গিয়ে শেষের ডিজিটগুলো অসাবধানতায় ভুল করায় অন্য নাম্বারে চলে যায়। কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝে ফেলি প্যাচ লেগে গিয়েছে। সরি বলে রেখে দিই।

সে আবার ফোন করে। রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, কি রে ভাই, ফোন রাখলেন কেন?

কিছুটা ভয় নিয়েই বললাম, সরি, ভুল করে আপনার নাম্বারে কল করেছিলাম।

ফোন রাখতে চাইলে সে বললো, ভুল করে যখন ভুল নাম্বারে কল করেছেন তখন কিছুক্ষণ কথা বলতে নিশ্চয় অসুবিধা নেই। আমার নাম অমিত, আর আপনি...?

উত্তরে মুখস্ত বুলির মতো বললাম, দিয়া।

অমিত বললো, নামটা সুন্দর।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর ফোন রেখে দিলাম।

ঘটনাটা হয়তো ভুলেই যেতাম, কিন্তু দুই দিন পর আবার ফোন করলো সে। কিছুটা বিরক্তি নিয়ে ফোন ধরলাম। এবার সে বন্ধুত্বের অফার দিল।

উত্তরে হেসে বললাম, তার বন্ধুর সংখ্যা কি এতোই কম হয়ে গিয়েছে যে, অপরিচিতজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে? এভাবে কথার পিঠে কথা চলতে থাকে কিছুক্ষণ। ক্লান্ত হয়ে ফোন রেখে দিই।

আবারও সে ফোন করে এবং এক দাবি, বন্ধু হতে হবে।

ভেবে দেখবো বলে ফোন রাখলাম।

এরপর সে মাঝে মধ্যে ফোন করতো। কিন্তু আমরা সব সময় রিসিভ করতাম না। আর সবার মতো সেও বুঝতে পারেনি যে, সে দুজন দিয়ার সঙ্গে কথা বলছে। দুই একবার ফোন রিসিভ করলেও আমরা অনেক আগেই ভেবে রেখেছিলাম, কখনো তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবো না।

এখন আর সে ফোন করে না। কারণ হয়তো সে বুঝে গিয়েছে, আবেগ নামের বস্তুটি আমাদের নেই বললেই চলে কিংবা হয়তো বুশ যেমন লাদেনকে খুজছে তেমনিভাবে সেও এখন অন্য কোনো ফোন ফ্রেন্ড খুজছে।

পর্ব তিন

ড. সুমন্তের সঙ্গে আমাদের প্রায় কথা হয়। আমাদের বাসার সবার সঙ্গেই তার ভালো সম্পর্ক রয়েছে। হঠাৎ একদিন সে চ্যালেঞ্জ করে আমাদের যে, আমাদের কণ্ঠস্বরের পার্থক্য ধরতে পারবে এবং কথাটা সে কিছুটা হেয় করেও বলে।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি।

এরপর তাকে ফোন করি আলাদা মোবাইল থেকে। তার সঙ্গে বেশ ভালো একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং মজার ব্যাপার, এখানেও আমাদের নাম দিয়া। সুতরাং পাঠক বুঝতেই পারছেন আমরা জয়ী। এখন পর্যন্ত সে বুঝতে পারেনি আমাদের আসল পরিচয়। হয়তো যায়যায়দিনের এ লেখার মাধ্যমেই সে জানতে পারবে কিভাবে তাকে *মদন* বানানো হয়েছে এবং তখন হয়তো বা সে হেসে বলে উঠবে, এখানে সূক্ষ্ম নয়, স্থূল কারচুপি হয়েছে।

আজকের কালারফুল দিয়া সমাচারের এখানেই সমাপ্তি। আগামী ভালোবাসা দিবসে আবারও অন্য কোনো *দিয়া সমাচার* শোনার আমন্ত্রণ রইলো।

শুভ ভালোবাসা দিবস।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, ঢাকা থেকে

টালোবাসা

– হারুন

সবেমাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। মানসীর নাম ছিল ইসরাত জাহান শম্পা। টানা তিন বছর প্রেম করার পর তার বিয়ে হয়ে যায়। তারপর থেকে ট্রেম ও টালোবাসা হয়েছে প্রায় দুই হালির মতো। কিন্তু কাউকে মন দিয়ে ভালোবাসতে পারিনি। এমনি এক ট্রেমিকা আনু।

১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি। দুপুরবেলা প্রতিদিনের মতো আলাউদ্দীন হোটেলে আড্ডা দিয়ে বাসায় ফিরছি। রাস্তার পাশেই সেলিমের বাড়ি। তাদের বাড়ির পরে আমাদের বাড়ি। বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেলিম। দিনে দুইবার তাদের বাড়ি যাওয়া চাই। না, সেলিমের কোনো বোন নেই। বোন নেই বলতে অবিবাহিত কোনো বোন নেই।

বন্ধুর বাড়িতে উকি দিতেই দেখলাম সুন্দরী এক ললনা। বেনি করা চুল, লাল টিপের সঙ্গে লাল ফিতা, লাল লিপস্টিক দারুন ম্যাচ করেছে। লোভ সামলাতে না পেরে *লাল শাড়ি, লাল চুড়ি, তোমার জন্য আজ এনেছি* গান গাইতে গাইতে ভেতরে ঢুকলাম।

সেলিমের বেডরুমে উকি দিয়ে দেখলাম পারভীনকে নিয়ে গল্প করছে। সেলিমের মামাতো বোন পারভীন। আধো আধো সম্পর্ক চলছে।

দরজায় হেলান দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি রে? স্বর্গীয় সুধা নরক কীটের মাঝে।

সবই উপরওয়ালার ইচ্ছা। বোস।

না রে, যাই।

যাবি মানে? তোর জন্যই তো অপেক্ষা করছি। সিনেমায় যাবো, দুই রমণীকে সামলাই কি করে বন্ধু? তাই তো অপেক্ষা। আম্মা নেই, ডাইনিংয়ে খাবার আছে, জলদি খেয়ে নে।

সিনেমায় ঢুকলাম। দুটি ডাবল সিট। চারটা টিকেট নিয়ে বক্সে বসলাম। পেছনে তারা দুইজন, সেলিম এবং পারভীন। তাদের সামনের দুই সিটে আমি আর সেই মেয়ে।

সিনেমা শুরু হলো। সামনে দিকে চেয়েই বললাম, লজ্জা নারীর ভূষণ, তবে বেশি লজ্জা ভালো নয়। সিনেমা পর্যন্ত এসেছেন।

কি করতে হবে আমাকে? বললো মেয়েটি।

বললাম, না কিছু করতে হবে না।

সিনেমা চলছে, চলছে আলাপ।

নাম কি?

মিস আনোয়ারা হক আনু। নিউ টেন। চার ভাই বোন। আব্বা দেশের বাইরে। আপনারা কয় ভাইবোন? কোনোদিন প্রেম করেছেন, বিয়ে হলো কেন? ইত্যাদি।

বিরতির সময় বাইরে গেলাম। সেলিমও বের হলো। বাদামসহ কিছু খাবার কিনলাম। সেলিম বললো, একটা চুমু দিতে না পারলে শালা আমার সঙ্গে কথা বলবি না।

ছোট্ট করে বললাম, এ তো তোরই বন্ধু।

সিনেমা শুরু হলো। শুরু হলো বাদাম খাওয়া। তাকে বাদাম দিতে হাত বাড়ালাম। আমার হাত থামিয়ে দিয়ে তার হাতের বাদাম আমার মুখে পুরে দিল।

খেতে খেতে বললাম, আনু, অনেক দিন পর শূন্য হৃদয়টা আবার ভরে দিলে। কষ্ট যে খুব কষ্টের। পারো না আমার কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে?

আনু তার মুখটা কানের পাশে এনে বললো, চেষ্টা করবো।

সত্যি!

আর দেরি নয়। মুখটা ধরে ফেললাম দুই হাতে। টেনে নিলাম কাছে। আলতো করে ঠোটে, তারপর কপালে, চোখে একে দিলাম চুমুর আলপনা। পেছন থেকে কাশির শব্দ পেলাম। ডান হাতটা উচু করে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করলাম।

কয়েকদিন পরেই ঢাকা চলে গেলাম। বিসিক–এর একটা ট্রেনিং শেষ করে তিন মাস পরে বাড়িতে ফিরলাম।

প্রতিদিনের মতো আলাউদ্দীন হোটেলে আড্ডা দিয়ে রাত নয়টার দিকে বাড়িতে ফিরলাম। ঘরে ঢুকতেই দেখি টেবিলে বসে লেখালেখি করছে ছোট ভাই মামুন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি রে, চিঠি লিখিস নাকি?

হ্যা। উত্তর দিল মামুন।

প্রাপকের নামটা...।

আনু।

দুর্গাপুর?

হ্যা। বললো মামুন।

মামুন আমার তিন বছরের ছোট। নিউ মার্কেটে আমাদের একটা রেডিমেড পোশাকের দোকান আছে। সেটাই এখন দেখাশোনা করে সে।

যাই হোক। আর কথা হলো না।

রাতে খাওয়ার পরে বিছানায় শুয়ে একটা সিগারেট ধরালাম।

মামুন। ডাক দিতেই সাড়া পেলাম।

কতোদূর? উদ্দেশ্য করে বললাম।

না। ভয় নেই, বেশি দূর যাওয়ার ছেলে আমি নই। তাছাড়া তোর ভাই বলে কথা! টানা টানা কথায় জবাব দিল মামুন।

তা নয়। বলছিলাম মেয়েটা সম্পর্কে কতোটুকু জানিস?

বললো, হ্যা জানি। তোকে চেনে।

সিনেমা দেখার কথা বলেছে নিশ্চয়।

হ্যা বলেছে।

দেখ মামুন, মেয়েটা বোধহয় খুব ভালো নয়।

আমরা কি খুব ভালো? তাছাড়া তোর আরম্ভ করা কার্যক্রম শেষ করছি মাত্র। ভয় নেই। বললো মামুন।

আর কোনো কথা বলতে পারিনি মামুনকে।

চাপাইনবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ থেকে

বাচা

– মিরাজ

মাস সাতেক আগের ঘটনা। তারিখটা ঠিক মনে নেই। মন খারাপ থাকায় সন্ধ্যার কিছু আগে সংসদ ভবনে গেলাম একাই। সংসদের বিশাল মাঠের মাঝে বসেছিলাম। অবশ্য সেদিন একটা কাজ ছিল। মনের মানুষের সঙ্গে ডেট ছিল। যদিও সেদিন সে আসেনি। থাক সে কথা। আসল কথায় আসি।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর লক্ষ্য করলাম, অপূর্ব সুন্দর একটা মেয়ে কিছু দূরে বসে আছে। কৌতূহল দমন করতে না পেরে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কারো জন্য অপেক্ষা করছে কি না?

জবাবে মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে জানালো, হ্যা, অপেক্ষা করছে। সেখান থেকে চলে আসতে চাইলাম। তখন সে ডাকলো। বললো, আমার তিনি না আসা পর্যন্ত আপনি কি আমাকে সঙ্গ দেবেন?

সুন্দরী মেয়ের প্রস্তাব ফেরাতে পারলাম না। তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম। জানলাম তার নাম রেশমা। বাসা মনিপুরিপাড়া। সেও আমার নাম, বাসা, ফোন নাম্বার নিল। গল্প করলো রাত নয়টা পর্যন্ত। কখন যে এতো রাত হলো বুঝলামও না।

বললাম, আপনার তিনি তো আর আসলেন না। নাকি আমাকে দেখে চলে গেছে।

জবাবে বললো, তিনি গেছে তো কি হয়েছে? আপনি তো আছেন।

বললাম, আমি তো আছিই। একজন সুন্দরীকে সঙ্গ দিতে পারলাম এর চেয়ে আনন্দের কি আছে? চলুন ওঠা যাক।

সে বললো, কোথায় যাবেন?

বললাম, বাসায়।

বাসা কি খালি, নাকি মেস? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো সে।

ঠিক বুঝলাম না। কিছুটা বিস্মিত হলাম।

আমার অবাক হওয়া সম্ভবত সে লক্ষ্য করছিল। তাই বললো, আমি ভেবেছিলাম আপনি কোনো হোটেলে উঠবেন। এ পর্যন্ত কোনো বাসায় যাইনি তো, তাই।

এবার আরো অবাক হলাম বললাম, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন কেন?

এবার সে অবাক হলো। অবাক কণ্ঠে বললো, আপনি আমাকে চেনেননি?

হ্যা, এবার চিনেছি।

সে চমৎকার ঢাকার এক নিশিকন্যা। ঘৃণায় শরীর রি রি করলেও কেন যেন তাকে ঘৃণা করতে মন চাইলো না। আসলে এতো সুন্দর মেয়েকে ঘৃণা করা যায় না, হোক না সে নিশিকন্যা। সেদিনের পর তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

কিন্তু এখনো তার একটি কথা আমার সারাক্ষণই কানে বাজে – আপনারা ভালোবাসেন প্রিয় মানুষটির স্পর্শের জন্য, তাকে এক নজর দেখার জন্য। আর আমরা শরীর দিয়ে ভালোবাসি বেচে থাকার জন্য। এবার বলুন কার ভালোবাসা শ্রেষ্ঠ?

ইব্রাহিমপুর, মিরপুর, ঢাকা থেকে

হোয়াট উইমেন ওয়ান্ট

– কামরুল হোসেন লিটু

অস্ট্রেলিয়ানদের সংক্ষেপে Aussie (অসি) বলে। এই অসি–রা ইংরেজি এমনভাবে উচ্চারণ করে যা প্রথম অবস্থায় আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল। ফলে দুই তিনটি কর্মস্থান থেকে কর্মচ্যুত হয়ে গেলাম দ্রুত। সে সময় প্রায় প্রতিদিনই আটলান্টিকের ওপার থেকে আমার বড় ভাই ফোনে আমাকে প্রচণ্ড ভর্ৎসনা ও ব্যাপক দিকনির্দেশনা দিতে লাগলেন। খুবই হতাশাজনক অবস্থায় পড়ে গেলাম।

যাহোক, বহু চেষ্টা ও ছোটাছুটির পর একটা ভালো কাজ পেয়ে গেলাম। নতুন কাজে সদাসতর্ক থাকতাম। সব কাজ সঠিকভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করে ফেলতাম। আমার বস এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সহকর্মীরা আমার প্রতি প্লিজড হয়ে গেল। তারপরও প্রায়ই আতংক বোধ করতাম কি জানি কখন না আবার চাকরিটা চলে যায়!

আমার কাছে সব সময় একটা ওয়ারলেস রেডিও থাকে। আমাকে কোনো বিষয়ে প্রয়োজন হলে ওই রেডিও মারফত বার্তা পাঠায় এবং আমি সে অনুযায়ী কাজ করি। প্রায়ই ক্যাথরিন ও ডেভিড–এর অনেক কথাই বুঝতাম না। ফলে দ্রুত তাদের অবস্থানে গিয়ে খুবই বিনয়ীভাবে তার বক্তব্যটা বুঝে নিয়ে তা করে দিতাম।

ক্যাথরিন, ডেভিড এরা আমার সমস্যাটা বুঝতো। ফলে তারা মনে করতো একটা কাজে আমাকে তাদের প্রয়োজন, অথচ রেডিওতে বললে আমি বুঝবো না। তখন তারা আমাকে তাদের অফিসে দেখা করতে বলতো এবং তারা পরিষ্কার ইংরেজিতে আমাকে বুঝিয়ে দিতো।

পেশাগত কারণেই ক্যাথরিনের অফিসে আমাকে প্রতিদিনই কয়েকবার যেতে হতো। যখন ক্যাথরিন, ডেভিড বা শার্লোট ব্যস্ত থাকতো না তখন আমার সঙ্গে তারা বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ জমাতো।

প্রায়ই আমি তাদের বক্তব্যের কিছু অংশ বুঝতাম না। তখন আমাকে সেটা তারা বিভিন্নভাবে বোঝাতো, এতে তারা এক ধরনের মজা পেতো। আসলে প্রতিটি মানুষই মাঝে মধ্যে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পছন্দ করে যদি শিক্ষার্থী মনোযোগী ও বোকা বোকা ক্লাসের হয়। আর আমি

সত্যিকার অর্থেই এদের ইংরেজি বোঝার ব্যাপারে আগ্রহী এবং আন্তরিক। অন্যদিকে কেউ কোনো কিছু না বুঝলে তার মুখভঙ্গিতে যে বোকা বোকা ভাব ফুটে ওঠে এটাও স্বাভাবিক।

দিন, সপ্তাহ, মাস যেতে যেতে ডেভিড, ক্যাথরিন, শার্লোট এদের সম্পর্কে সব জানতাম এবং তারাও আমার বিষয়ে জানতো। আমাদের মধ্যে একটা চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠলো। প্রায়ই তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম। তাদের জীবনযাত্রা থেকেই জানতে পারতাম অস্ট্রেলিয়ান জীবনধারা।

আমার কাছে আশ্চর্য লাগতো জেনে যে, ক্যাথরিন তার বয়ফ্রেন্ডকে কখনো বিয়ে করবে কি না সেটা সে জানে না। তবে তাকে সে প্রচণ্ড ভালোবাসে এবং তার প্রতি সে অত্যন্ত বিশ্বস্ত। হয়তো আজীবনই এভাবে এক সঙ্গে থাকবে। কিন্তু বিয়ে করা হবে না। ক্যাথরিনের বয়স আটাশ। জিজ্ঞাসা করি, তুমি বাচ্চা নেবে না?

সে অবাক হয়ে বলে, আমি খুবই ইয়াং। এতো অল্প বয়সে বাচ্চা নেয়ার কথা চিন্তাও করি না।

আমি লক্ষ্য করেছি, সম্ভ্রান্ত পর্যায়ের অধিকাংশ অস্ট্রেলিয়ানরাই পয়ত্রিশের পরে বাচ্চা নেয়। এমনো দেখেছি, পঞ্চাশ–এর পরে প্রথম বাচ্চা নিয়েছে।

নিক আমার সমবয়সী, সে খুব ফানি। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলবে, হাই বাডি, হাউ আর ইউ? গত উইকএন্ডে সে ইটালি, না আইরিশ, না ইংলিশ কার সঙ্গে সেক্স করেছে, মেয়েটা কি রকম চিৎকার ধ্বনি করছিল। সে কি কি করেছিল তা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে আমাকে দেখাবে।

নিক সুদর্শন। যে কোনো মেয়েই তার প্রতি আগ্রহী হওয়া স্বাভাবিক। আর এখানকার মেয়েরা যে কতো সুন্দরী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদের সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়ার সহজ উপায় এক একটি মেয়েকে আপনি মনে করতে পারেন নিকোল কিডম্যান, শ্যারন স্টোন, জেনিফার লোপেজ, জুলিয়া রবার্টস। তবুও নিক–এর মন ভরে না। তার বক্তব্য হলো, প্রতি উইকএন্ডে সে ভোগ করতে চায় নিউ অ্যান্ড ফ্রেশ পুসি।

এ রকম নিক, এডাম, ব্রুনো–র সংখ্যা কম নয়।

আবার এখানে বহু চোখ ধাধানো রূপবতী আছে যারা লেসবিয়ান বা নারী সমকামী। কেউ কেউ উভকামী অর্থাৎ সে একজন পুরুষ সঙ্গী এবং মেয়ে সঙ্গী উভয়ের সঙ্গেই সেক্স করে আনন্দ পায়।

প্রতি বছর মার্চের প্রথম শনিবার সন্ধ্যায় সিডনির অক্সফোর্ড স্ট্রটে গে (Gay) বা পুরুষ সমকামী এবং লেসবিয়ানদের জমকালো প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। ইওরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে ওই প্যারেডে অংশগ্রহণ করতে গে এবং লেসবিয়ানরা আসে। অংশগ্রহণকারী ওই সব লেসবিয়ান মেয়েদের রূপের কারিশমা দেখলে যে কোনো পুরুষেরই বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যেতে বাধ্য।

একদিন একটা কাজে ক্যাথরিনের অফিসে গেলাম। ক্যাথরিন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। আমাকে দেখে বললো একটু অপেক্ষা করতে। আমি তখন রিসেপশন ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা *মর্নিং হেরাল্ড* পত্রিকায় একটা সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখছিলাম মেল গিবসন অভিনীত *হোয়াট উইমেন ওয়ান্ট।* নারীরা কি চায়?

কিছুক্ষণ পর ক্যাথরিন এসে আমি কি পড়ছি তা দেখে বললো, তুমি কি জানো, মেল গিবসন অস্ট্রেলিয়ান?

বললাম, হ্যা, আমি তার *ব্রেভহার্ট* ছবিটা দেখেছি আমার দেশে। তবে আরনল্ড শোয়ার্জনেগারকে পছন্দ করি তার অ্যাকশন–এর জন্য।

ক্যাথরিন বললো, আমি কমেডি ছবি পছন্দ করি। শোয়ার্জনেগার একটা কমেডি ছবিতে প্রেগনান্ট হয়েছিল। মজার ছবি ছিল। হোয়াট উইমেন ওয়ান্ট কমেডি ছবি। উইকএন্ডে ছবিটা দেখো।

বললাম, তুমি তো উওম্যান। তুমি কি বলবে, আসলে তোমাদের দেশের মেয়েরা কি চায়?

ক্যাথরিন হেসে বললো, এটা তোমার ভবিষ্যৎ গার্লফ্রেন্ডের কাছ থেকে তুমি জেনে নিও।

বললাম, তা সেটা জানা যাবে। তবে আমাদের দেশের মেয়েরা কি চায় এ বিষয়ে আমার একটা রসালো স্মৃতি আছে। তুমি যদি শুনতে চাও তাহলে তোমাকে তা বলতে পারি। এ ব্যাপারে তোমার অনুমতি প্রয়োজন। কারণ এটা কিছুটা এডাল্ট।

ক্যাথরিন বললো, কোনো সমস্যা নেই। তুমি বলতে পারো।

ঘটনাটা আমার স্কুল জীবনের। আমার আব্বাহুজুর বলতেন, পড়াশোনায় ভালো এমন ছাত্রদের সঙ্গে মিশবি। তার কথা মতো ভালো ছাত্রদের সঙ্গেই মিশতাম। বাচ্চু হলো পড়ালেখায় ভালো এমন বন্ধুদের একজন। সে সময় এসএসসি পরীক্ষা খুব কাছাকাছি সময়ে, তাই স্কুল থেকে পরীক্ষার্থী ছাত্রদের বিশেষ কোচিং দেয়া হচ্ছিল।

বাচ্চুদের বাড়ি স্কুলের কাছেই। ফলে সে টিফিন আওয়ারে বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসতো এবং প্যান্ট পাল্টে লুঙ্গি পরে আসতো। যথারীতি একদিন সে লুঙ্গি পরে ক্লাসে এলো। আমি ও বাচ্চু বসেছিলাম এক ডেস্কে। ক্লাস চলছিল ইসলাম ধর্মের। মৌলভিস্যারের প্রতি আমরা মনোযোগী না থেকে নিজেরা গল্পে মনোযোগী ছিলাম।

বাচ্চু বললো, জানিস মেয়েরা ছেলেদের কাছে কি চায়?

বললাম, কি রে!

আমি বিশ্বাস করতাম বাচ্চু ক্লাসের সেকেন্ড বয় অর্থাৎ ভালো ছাত্র। অতএব সে যা জানে এবং বলে সেটাই সঠিক। এছাড়া আমাদের স্কুলে কোনো মেয়ে পড়তো না। কারণ এটা ছিল বয়েজ স্কুল। এ জন্য মেয়েদের প্রতি সবাই কৌতূহলী ছিল। প্রত্যেকেই গল্প করতো, এসএসসি পাস করলেই কলেজে ভর্তি হবে, তখন মেয়েদের সহপাঠী হিসেবে পাওয়া যাবে। তার মানেই প্রেম করা যাবে।

বাচ্চু বললো, ঠ্যাং চায়।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম, ঠ্যাং চাইবে কেন? মেয়েদেরও তো ঠ্যাং আছে।

বাচ্চু বললো, মেয়েদের ঠ্যাং দুটো। কিন্তু ছেলেদের ঠ্যাং তিনটে। তারা মাঝখানের ঠ্যাংটা চায়। এরপর এই দ্যাখ। বলেই তার দুই উরুর মাঝখানে উত্থিত শিশ্নটা ওই অংশের লুঙ্গিটাকে তাবুর মতো উচু করা অবস্থায় আমাকে দেখালো।

বাচ্চুর মাঝখানের ঠ্যাংটা দেখে খিল খিল করে হেসে ফেললাম।

মৌলভিস্যার তখন বিদায় হজের বিষয়ে পাঠদান করছিলেন। আমাদের ডেস্কের সামনে এসে আমার হাসির কারণ তিনি জানতে চাইলেন।

আমি আর মাঝখানের ঠ্যাং বিষয়ক কথাটা বলতে পারলাম না। ফলে যা হওয়ার তা হলো। কান এবং গাল গরম করা একটা থাপ্পড় খেলাম।

ক্যাথরিন আমার লিটু নামটা লিথো উচ্চারণ করতো। গল্প শুনে সে গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু মুখে কিছুটা হাসি হাসি ভাব রেখে ক্যাথরিন বললো, লিথো, ইউ আর এ নটি বয়।

সিডনি থেকে

প্রাপক পারু প্রেরক দেবদাস

– মামুন

পারু,

শরৎবাবুর চক্রান্তে তোমার বিপন্ন জীবন প্রাপ্তি এবং আমার মৃত্যুর পর সেই থেকে তোমাকে খুজছি। আমার জগৎ আলাদা। এ জগতে শব্দ নেই। আধো ঘুম, আধো জাগরণের মাঝে স্বপ্নের মতো দেখে যাওয়া শব্দহীন সব অসংখ্য জীবনের ছবি। কখনো হাওয়ায় ভেসে চলে আমার জীবন। তোমাদের সংজ্ঞায় রোমান্টিক। টাইম মেশিনের গতিতে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে আমি ঘুরে আসি মাঝে মধ্যেই। সেই পৃথিবী ভ্রমণের মাঝে তোমাকে খুজেছি। কিন্তু পৃথিবীর স্বার্থপর মানুষের তোমাকে চেনে, তোমার দুঃখকে চেনে, এমনকি আমার মৃত্যু খবরও তাদের অজানা নয়। আশ্চর্য, তারা জানে না শুধু তোমার ঠিকানাটা!

জানো, শরৎবাবু যদি আমাকে না মেরে ফেলতেন, যদি না তোমাকেও দুঃখের সাগরে বাচিয়ে না রাখতেন তাহলে তুমি দেখতে আজ আমি–তুমি এতো বিখ্যাত হতাম না। মানুষ অন্যের দুঃখে চোখের পানি ফেলে যতো না, দুঃখ প্রকাশ করে তার চেয়ে বেশি, বরং দুঃখকে উপভোগ করে। কেউই স্বেচ্ছায় দেবদাস হতে চায় না। অথচ দেবদাসের মৃত্যু এখনো তাদের কাছে বেশ উপভোগ্য যার প্রমাণ সাম্প্রতিক সময়ে বলিউডে এবং বাংলাদেশে নির্মিত ছায়াছবি *দেবদাস*।

পারু, তুমি জানো না, মৃত্যুর পর আমার টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া আত্মা বিভিন্ন মানুষের বুকে স্থান করে পৃথিবীতে ছিল। এখনো তেমন আছি কোথাও কোথাও। আমার কোনো অংশ কখনো কখনো ঢাকা শহরের নাটক সরণির রাস্তা ধরে হাটতে থাকে *জন প্লেয়ার* পোড়াতে পোড়াতে। আবার কখনো চারুকলার সামনে খোচা খোচা দাড়িসহ চাদনি রাতে বসে থাকি অথবা কোনো নবীন লেখকের মনে ঢুকে তার মনটাকে আজীবনের জন্যে কনফিউজড করে দিই। আমার আত্মা যার শরীরেই প্রবেশ করেছে, এদের সবার মধ্যে একটা বিষয়ে আশ্চর্য মিল আছে। তা হলো, এরা সবাই মানুষ হিসেবে চিরদিনের জন্যে জটিল হয়ে গেছে যতোটা না অন্যজনের কাছে, তার চেয়ে বেশি নিজেদের কাছে।

পারু, এক সময় ভাবতাম, তোমার আত্মার সঙ্গে আমার আত্মার মিলন হলেই মঙ্গল। কিন্তু আজকাল ভয় হয়। মনে হয় দেখা না হওয়াই ভালো। কারণ সময়ের স্রোত আমাদের দুইজনের মনে অবশিষ্ট আর কিছু রেখে গেছে কি না আমরা জানি না। আমার সময়ের পারু কিংবা পারুর সময়ের দেবদা হয়তো আর আগের মতো নেই। তাই আমরা বরং আমাদের সীমাহীন কল্পনারাশির মাঝেই বাচিয়ে

রাখবো একে অন্যকে অথবা আমরা বেচে থাকবো প্রচারহীন অসংখ্য পারু–দেবদার বুকে তাদের প্রিয় মানুষ হারানোর দুঃখের মাঝে কিংবা কারো প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষার মাঝে।
তোমার চিরকালের দেবদা

সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা থেকে

সত্যি কথা

তখন আমি এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। ভালোই কাটছিল বন্ধুসহ দিনগুলো। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে প্রাইভেট পড়তে শুরু করলাম। হঠাৎ একদিন পরিচয় হলো একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটির নাম সাদিয়া। দুই তিন মাসের মধ্যে ভালোলাগা, অতঃপর ভালোবাসা।
এভাবে কেটে গেল অনেক দিন। সকালে কলেজে ক্লাস ফাকি দিয়ে বসে গল্প শুরু করতাম। শেষ হতে দুপুর গড়িয়ে যেতো। রাতে শুয়ে শুধু সারাদিনের কথা পুনরায় মনে করতাম। এই কয়টি মাসে সাদিয়া আমাকে এবং আমি তাকে কখনো সরাসরি ভালোবাসার কথা প্রপোজ করিনি।
আমার কলেজ জীবনের প্রথম ১৪ ফেব্রুয়ারি। কলেজে ঢুকে দেখি সাদিয়া রজনীগন্ধা এবং গোলাপের এক গোছা ফুল নিয়ে দাড়িয়ে আছে। আমার হাতে দিয়ে বললো, আই লাভ ইউ।
জীবনে এই প্রথম কোনো মেয়ের কাছ থেকে এ কথা শুনলাম। আমরা দুজনে কলেজের পেছনে গিয়ে বসে গল্প শুরু করলাম। তখন আমি অনেকটা আকাশ দিয়ে উড়ছি। এই সময় তাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করলাম যেমন ক্ষুধার্ত বাঘ তার আহারের সময় হরিণের দিকে লক্ষ্য করে। নিজেকে সামলাতে পারলাম না। ছোট করে একটি চুমুতেই সীমাবদ্ধ রাখলাম।
সাদিয়ার কাছ থেকে শুধু উত্তর পেলাম, শয়তান কোথাকার!
এভাবে কেটে গেল একটি বছর। হঠাৎ একদিন তার বান্ধবীর কাছ থেকে শুনতে পেলাম তার বিয়ে হয়ে গেছে। ইচ্ছা করে আমাকে আগে জানায়নি। আমার জন্য একটি চিরকুট দিয়েছে।
তাতে লেখা – *তুমি আমাকে কখনো ভালোবাসোনি।*
রাতে শুয়ে চিন্তা করলাম, কথাটি সত্যি।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বৌ রচনা

– ওয়াহিদুল ইসলাম হানিফ

আমার দাদুর বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। এখনো শরীর, স্বাস্থ্য বেশ মজবুত। এক সময় শিক্ষকতা করতেন। দশ গ্রামে এক নামে সবাই চেনে। যে কোনো বিচার–আচারে এখনো দাদুর কথাই শেষ কথা। দাদুর একটা দুর্বল দিক আছে। তিনি ৫৫৫ সিগারেটের প্রচণ্ড ভক্ত। এই বয়সেও এ নেশা ছাড়তে পারছেন না। বাদী অথবা বিবাদী যে পক্ষ আগে এসে দাদুর পকেটে ৫৫৫ সিগারেটের একটা

প্যাকেট গুজে দিতে পারতো তার জয় প্রায় নিশ্চিত। ওনার বিচার করার ভঙ্গিমা ভারী অদ্ভুত। সব কিছু খুটিনাটি তার জানা চাই।

একবার আলাতন নামের এক বিধবা মহিলার ঘরে ঢুকে আমাদের গ্রামের লোকমান ধর্ষণ করলো এবং হাতেনাতে ধরা পড়লো। বিচার বসেছে। যথারীতি দাদু উপস্থিত। আমার ধারণা, লোকমান আগেই দাদুর পকেটে সিগারেটের প্যাকেট ঢুকিয়ে দিয়েছে।

দাদু বললেন, তারপর আলাতন, *সেই রাতে কি হলো খোলাসা কইরা কও দেহি।*

আলাতন কাদো কাদো মুখে বলা শুরু করলো,

দাদু, সেই রাইতে ঘুটঘুইটা অন্ধকার। চোখে কিছু দেহন যায় না। শুইয়া রইছি। হঠাৎ দেখি আমার ঘরের ঝাপ আস্তে খুইল্যা যাইতাছে। চিৎকার দেওনের আগেই লোকমাইন্যা আমার মুখ চাইপ্যা ধরলো। হের পর বিছানার দিকে টাইন্যা লইয়া গেল।

তারপর কি হলো? দাদু প্রশ্ন করলেন।

তারপর যা করনের তা তো করলো।

কি করলো? দাদু আবার প্রশ্ন করলেন।

যা করনের তা তো করলো দাদু।

দাদু রেগে গেলেন। *আরে, মাগি কি করলো হেইডা খোলাসা কইরা কবি তো।*

সবাই বসে আছে। বিচারের রায় হয় না। দাদু নিবিষ্ট মনে চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট টেনে চলেছেন। সবাই বিরক্ত। কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারছে না। কারণ দাদু ভীষণ রাগী।

শেষে লোকমানই বিরক্ত হয়ে বললো, *দাদু, শাস্তি যা দেওনের তাড়াতাড়ি দিয়া দেন। আমার আবার গরু লইয়া ক্ষেতে যাইতে হইবো।*

এই হচ্ছে আমার দাদু। আমাকে খুব স্নেহ করেন দাদু। আমার মায়ের ধারণা, দাদুর লাই পেয়ে আমি বখে গেছি। আমার কোনো অপরাধই দাদুর কাছে অপরাধ বলে মনে হয় না। পাড়ার এমন কোনো সুন্দরী মেয়ে নেই যার সঙ্গে প্রেম করার সুযোগ খুজিনি। কিন্তু মেয়েগুলো এতো ফাজিল যে, কিছুদিন প্রেমের অভিনয় করে তারপর একদিন কেটে পড়ে। শেষে বিরক্ত হয়ে মেয়েদের *গুষ্ঠি কিলাই* জাতীয় বকা দিয়ে যখন প্রতিজ্ঞা করতে শুরু করেছি যে, মেয়েদের কাছ থেকে একশ হাত দূরে থাকবো তখনই আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামের ক্লাস টেনে পড়ুয়া এক মেয়ের প্রেমে পড়লাম।

হায় বিধাতা! মেয়েটি এক মাওলানা সাহেবের মেয়ে। মেয়ের নাম উম্মে কুলসুম। নিনজা বোরখা পরে স্কুলে আসতো কুলসুম। আমি যখন তৃষ্ণিত নয়নে তার দেখা পাবার আশায় স্কুলের পথে দাড়িয়ে থাকতাম, সে আসসালামু আলাইকুম বলে আমার পাশ দিয়ে হেটে যেতো। আমি শুধু তার চোখ দুটো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতাম না।

একদিন কুলসুমের বাবা মাওলানা সাহেব কেমন করে যেন আমাদের প্রেমের কথা জেনে গেল। এবং কুলসুমের স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে গেল।

হায় কলসুম! হায় কুলসুম! করতে করতে আমি পাগল হয়ে গেলাম এবং ঠিক আগের জায়গায় গিয়ে দাড়িয়ে থাকলাম।

এভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন একটা মেয়ে আমার কাছে এলো। কুলসুমের বান্ধবী। নাম রচনা। কুলসুমের চিঠি নিয়ে এসেছে। কুলসুম লিখেছে, সে আমাকে না পেয়ে স্যাভলন খেয়ে আত্মহত্যা করবে। এভাবে রচনার মাধ্যমে আমাদের চিঠি দেয়া–নেয়া চললো।

একদিন আবিষ্কার করলাম, আমি রচনারই প্রেমে পড়ে গেছি। রচনাও তাই।

রচনা বোধহয় আমার স্বভাব আগেই টের পেয়েছিল। একদিন জোর করে ধরে নিয়ে গেল কাজি অফিসে। আমাকে ধমক–ধামক দিয়ে বাধ্য করালো কাবিননামায় সই করতে। সাক্ষী সে আগেই জোগাড় করে রেখেছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে বললো চলো।

কোথায় চলবো? আমি ভ্যাবলার মতো বললাম।

কোথায় আবার! হাদারাম কোথাকার। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি রেখে কোন দুঃখে বাপেরবাড়ি থাকতে যাবো। আমার একটা প্রেস্টিজ আছে না।

আমার মাথায় পুরো পৃথিবী ভেঙে পড়লো।

সন্ধ্যার পর চুপি চুপি রচনাকে নিয়ে দাদুর ঘরে গেলাম। দাদু তখন চেয়ারে হেলান দিয়ে *যুবক–যুবতীদের আধুনিক প্রেমপত্র* নামে একটি বই পড়ছিলেন। দাদুর পেছনে গিয়ে ডাকলাম, দাদু।

বলে ফেল। বই থেকে মুখ না সরিয়েই বললেন।

দাদু বলছিলাম কি, মানে ইয়ে।

এতো ইয়ে ইয়ে করছিস কেন? কি হয়েছে?

দাদু, ইয়ে মানে, রচনা।

কি রচনা?

মানে বৌ রচনা।

বৌ রচনা। এ জাতীয় রচনা আবার তোদের কলেজের পরীক্ষায় আসে নাকি?

ধুত্তোরি ছাই দাদু। ঘুরে দেখো না!

দাদু ঘুরলেন এবং আমার পেছনে রচনাকে আবিষ্কার করলেন। বার দুই চোখ পিট পিট করে হুংকার ছাড়লেন, মেয়েটা কে?

বৌ।

কার বৌ?

তোমার না, অন্তত এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো।

হুম, বুঝেছি। তা আমাকে কি করতে হবে?

মাকে ম্যানেজ করতে হবে।

পারবো না। বলেই দাদু ঘুরে বসলেন।

আমি দাদুর পা জড়িয়ে ধরলাম।

দাদু, রচনা আমার শীতের দিনের লেপ–তোষক, গরমের দিনের ঠাণ্ডা শরবত। তাকে না পেলে আমি বুড়িগঙ্গা নদীতে ঝাপিয়ে পড়বো। তখন সারা বুড়িগঙ্গা সেচেও আমার লাশ উদ্ধার করতে পারবে না।

হুমকিতে কাজ হলো। দাদু বড় বড় গলায় মাকে ডাকতে লাগলেন।

মা এলেন।

এই যে বৌমা, মেয়েটি বিপদে পড়ে আমাদের এখানে এসেছে। বড় বংশের মেয়ে। খুব লক্ষ্মী আর শান্ত। কিছুদিন আমাদের এখানে থাকবে।

মা মিনমিনে গলায় বললেন, কিন্তু বাবা, চিনি না, জানি না এমন মেয়েকে বাড়িতে রাখা ঠিক হবে?

কি বলছো বৌমা, মেয়েটাকে আমরা রাস্তায় ফেলে দেবো? আমরা মানুষ না। তার বাবার নাম শোনোনি? ওর বাবা হচ্ছে, ওর বাবা।

ওর বাবা নেই দাদু। ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম।

আহা, হা, ভেরি স্যাড! ভেরি স্যাড। এতিম মেয়েটা কোথায় যাবে বৌমা! তোমার কি একটুও দয়া–মায়া নেই?

তবুও মা ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করার চেষ্টা কররেন। কিন্তু বাবা, আমাদের বাড়িতে তো অতিরিক্ত রুম নেই। মেয়েটা থাকবে কোথায়?

কেন হানিফের রুমে থাকবে।

হানিফ থাকবে কোথায়?

ওর নিজের রুমেই থাকবে।

এ আপনি কি বলছেন বাবা।

দাদু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, মেয়েটাকে হানিফ বিয়ে করেছে বৌমা।

মা একই সঙ্গে অবিশ্বাস এবং রাগ নিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

আমি ততোক্ষণে খোলা দরজা দিয়ে ভৌ দৌড়।

জাজিরা, কোন্ডা, কেরানীগঞ্জ থেকে

হোসনে আরা

– সরোজিত কুমার দাশ

হোসনে আরা, ওই গলিতে যেও নাকো তুমি,
বলো নাকো কথা ওই মাস্তানের সাথে
কাম ব্যাক হোসনে আরা
ফ্লাড লাইটের মায়াবী রাতে।

ফিরো এসো ওই গলিতে সেই দোকানে
ফিরে এসো অন্তরের মাঝখানে
রিকশা করে আরো দূরে
মাস্তানের সাথে যেও নাকো আর।
কি গুজুর গুজুর তাহার সাথে? তার সাথে?

গলির আড়ালে গলি

গ্যাস ছাড়া বেলুনের মতো তুমি আজ
তার প্রেম গ্যাস হয়ে আসে।
হোসনে আরা,
তোমার হৃদয় আজ সিগারেটের ধোয়া
গ্যাসের ওপারে গ্যাস
গলির ওপারে গলি
কাম ব্যাক হোসনে আরা
কাম ব্যাক।
আকাশলীনা : জীবনানন্দ দাশের কবিতা অবলম্বনে

সরাপপুর, সাতক্ষীরা থেকে

পাগল প্রেমিক

– অনামিকা

চাকরিতে যোগ দেয়ার পর থেকে ছেলেটিকে লক্ষ্য করতাম। মনে মনে ছোট বোনের বর খুজতাম। কারণ ছোট বোন বিয়ের উপযুক্ত ছিল। ছেলেটি বিভিন্ন ছলছুতোয় আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতো এবং মনে মনে সে আমাকে ভালোবাসে তখন বুঝতে পারিনি।
একদিন ছোট বোনের একটা ছবি তাকে দেখাই এবং বলি পছন্দ হয় কি না দেখেন। কিন্তু সেটা পাত্তা না দিয়ে সে বলে ফেলে আমি তো আপনাকেই ভালোবাসি।
বললাম, সেটা কিভাবে হয়? আমি তো বিবাহিতা। সে কথা ভালো করেই সে জানে।
চাকরিতে যোগ দেয়ার কিছু পরে আমার প্রথম বাচ্চার জন্ম হয়। সবসহ সে আমাকে ভালোবেসেছে, আমি ভাবতেই পারিনি। আমার কথা–বার্তা, চাল–চলন নাকি তার ভালো লেগেছে। কিন্তু পরকীয়া সব সময়ই ঘৃণা করতাম।
যাহোক, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কিছুটা জড়িয়ে পড়লাম। নিষিদ্ধ জিনিস যেমন সব সময় দেখতে ইচ্ছা করে এটাও ঠিক তেমনভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে আমার ভেতর। কিন্তু তাকে কখনো বিয়ে করার কথা ভাবিনি। কেননা আমার স্বামীকেই আমি ভালোবাসি। প্রায় জোর করেই সে তার দিকে আমাকে ধাবিত করলো। সব কিছু প্রায় জোর করে করাতো। আমার ভালো লাগতো না। কারণ সে আমার থেকে চার পাচ বছরের ছোট হবে। আমার কাছে বেমানান (সে প্রায়ই বলতো, আই লাভ ইউ। কিন্তু আমি বলতাম না) মনে হতো। সে দেখতে সুন্দর, হ্যান্ডসাম বলা যায়। তবে ছোটখাটো। আর আমি তেমন সুন্দরী নই। এসব তার কাছে কোনো ব্যাপারই না। সে যে আমাতে বিলীন হয়ে গেছে এখন বুঝতে পারি।
এর ভেতরে তিন চার বছর হয়ে গেছে। তার হাত থেকে রক্ষা পেতে বললাম, বিয়ে করো। আমার ছোট বোনকে বিয়ে করতে চাইলো না, বোন কিছুটা আন্দাজ করে তাকে বিয়ে করতে চাইলো না।

পরে যখন তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল তখন আবার বোন রাজি হলো। কিন্তু আমি আর এগোইনি। কেননা পরবর্তী কালে খারাপ কিছু হতে পারে চিন্তা করে বাদ দিলাম।

শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে করলো। ভাবলাম বিয়ে করলে আমাকে ভুলে যাবে। হলো না। বিয়ে করে এসেই আমার হাতে চুমু খেলো। আমি বকা দিলাম। এভাবে কেটে গেল আরো বছর দুয়েক।

তার বৌ কিছুটা টের পেয়ে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটালো। কিন্তু কিছুতেই আমাকে সে ভুলতে পারছে না। আমি প্রায় তার সঙ্গে কথা বলা ছেড়েই দিলাম।

সে নাছোড়বান্দা। আমাকে ছাড়া সে অন্য কিছু ভাবতে পারে না। গত বছর সে এতো বিরক্ত করেছে যে, আমার হাতে অনেক মার খেয়েছে। মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছি, তারপরও বলেছে, আই লাভ ইউ।

সে প্রকৃতভাবে প্রেমিক। কিন্তু আমি কখনোই তাকে মন থেকে ভালোবাসতে পারিনি। কেননা স্বামী–সন্তান ছাড়া অন্য কিছু কখনো ভাবিনি। গত বছর তার জন্য খুব খারাপ গেছে। আমি তার সঙ্গে কথা বলিনি। তার বৌ মোটামুটি সুন্দরী। সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে যে, আমাকে তার স্বামী খুব বেশি ভালোবাসে। এবং বলেছে যে, আপনি তাকে পাত্তা দেবেন না।

আমি যে কখনোই তাকে বেশি পাত্তা দেইনি এ কথা সত্য। আমার মধ্যে কি আছে আমি জানি। যার জন্য সে এতো পাগল। আমি একটা মেয়ে হয়ে অন্য মেয়ের ক্ষতি করতে চাই না বলেই সরে যেতে চেয়েছি। অনেক সরেও গেছি। কিন্তু সে কিছুতেই পারছে না।

আমার নিষ্ক্রিয় মনমানসিকতায় সে বলেছে, আমার জীবন থেকে ফুল ঝরে গেল। গতকালও বলেছে, সে যদি হজ করতে যায় তাহলে আল্লাহর কাছে সে আমাকেই চাইবে, অন্য কিছু চাইবে না।

আমি বলেছি, আল্লাহর কাছে কেউ মানুষকে ভিক্ষা করে না। তার কৃপা চায়।

আমি বুঝি না সে আমাকে কেন এতো ভালোবাসে। সে বলেছে, তার ক্ষমতা থাকলে সে দ্বিতীয় তাজমহল বানাতো।

আপনারাই বিচার করুন, এমন প্রেমিক পুরুষকে কেউ ফেরাতে পারে কি না। কিন্তু আমি ফেরাতে চাই। কেননা আমি ছোট দুটি ফুটফুটে ছেলে সন্তানের প্রিয় জননী। অন্য কিছু চিন্তা ভাবনা আমার দ্বারা সম্ভব নয়? কারণ সে এখনো আমাকে বিয়ে করতে চায়।

ঠিকানাবিহীন

নীরব ভাষা

- রাসেল

ঢাকা ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরির তিন তলায় টেবিলের নিচ দিয়ে আমার পায়ের ওপর পা দিয়ে শিমু আয়েশি ভঙ্গিতে গুণ গুণ করে গান গাইছে। আগামীকাল আমাদের সেকেন্ডে ইয়ারের শেষ পরীক্ষা, অথচ আমাদের তেমন কিছুই পড়া হয়নি। শিমুই আমাকে আজ লাইব্রেরিতে আসতে বলে দিয়েছিল। অথচ শিমুর এমন নিশ্চিন্ত ভঙ্গি দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

শিমুর পায়ের তলা থেকে আমার পা সরিয়ে নিলাম। একটা নারী শরীরের স্পর্শে আমার মধ্যে কিছুটা রতিভাব জাগ্রত হচ্ছে যা আমার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। হোক পা, তবু এটা তো শিমুর শরীরেরই একটা অংশ। আমি শিমুর দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললাম, কি রে, পড়ছিস না কেন, সেই কখন থেকেই গান গাইছিস, পড়া কি সব হয়ে গিয়েছে?

আমার দিকে তাকিয়ে উদাস ভঙ্গিতে শিমু বললো, তোকে একটা কথা বলবো, রাগ করবি না তো?

বললাম, না, রাগ করবো কেন? বল না কি বলবি।

শিমু বললো, চল আমরা পরীক্ষাটা ডেফার করি।

আমার সামনে যেন একটা বোমা ফাটলো। কি বলে এ মেয়ে? পরীক্ষা ডেফার করতে হবে কেন অযথা! আমার প্রস্তুতিও খুব একটা ভালো না। কিন্তু হাতে তো এখনো অনেকটা সময় আছে। একটু চেষ্টা না করে আগেই ডেফার করার চিন্তা। শিমুকে জোরে একটা বকা দেয়া দরকার। কিন্তু এটা লাইব্রেরি, এখানে তো আমি কাউকে বকা দিতে পারি না। শিমুকে বললাম, বাইরে চল, চা খাবো।

শিমু প্রতিবাদ না করে উঠে এলো।

কিন্তু বাইরে এসে শিমুকে বকা দিলাম না। দুটো চায়ের অর্ডার দিয়ে লাইব্রেরির সামনের দেয়ালটার ওপর দুজন পাশাপাশি বসলাম। এবার সহানুভূতির সুরে বললাম, খুলে বল তো শিমু, পরীক্ষা কেন ডেফার করতে চাইছিস।

শিমু আহ্লাদী ভঙ্গিতে বললো, বিশ্বাস কর, একটুও পড়তে ইচ্ছা করছে না।

কণ্ঠে শ্লেষ মিশিয়ে বললাম, তো কি করতে ইচ্ছা করছে তোর?

শিমু আচমকা আমার শরীর সংলগ্ন হয়ে বললো, তোর আদর পেতে ইচ্ছা করছে। একটু আদর করবি?

এ রকম উদ্ভট আচরণ শিমু প্রায়ই করে। কিন্তু এখন এসবের সময় না। আমি কিছুটা কঠিন স্বরে বললাম, ইয়ার্কি না, সিরিয়াস, তুই পরীক্ষা দিতে চাইছিস না কেন?

কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থেকে শিমু কাতর স্বরে বললো, রাসেল, তুই পরীক্ষা দিতে চাইলে তোকে বিরত রাখার কোনো অধিকার আমার নেই। আমার ভুল হয়েছে তোকে বলা। তুই পরীক্ষা দে। কিন্তু আমার পক্ষে আগামীকাল পরীক্ষা দেয়া সত্যি অসম্ভব। শুধু এটুকু বলে শিমু থামলো।

কয়েক মুহূর্ত আমরা দুজনই নীরব রইলাম। তারপর নরম সুরে বললাম, শিমু, তুই হয়তো জানিস না, ডেফার করা অনেক ঝামেলার। দেখা যাবে আগামী বছর আমাদের কোর্স পরীক্ষার সঙ্গে ডেফার পরীক্ষা পড়ে গেছে তখন নতুন করে নোট করে পরীক্ষা দিতে গিয়ে ঝামলোয় পড়তে হবে। যাহোক, তুই যখন একান্তই পরীক্ষাটা দিতে চাইছিস না তখন আমিও দেবো না। কিন্তু এখনই আমি তোকে ছাড়ছি না। আমরা লাইব্রেরিতে বসে আরো একটু সময় চেষ্টা করে দেখবো।

শিমু সোৎসাহে রাজি হয়ে গেল আমার প্রস্তাবে। আমরা আবার লাইব্রেরির তিন তলায় গিয়ে বসলাম। কিন্তু একবার আমাদের মস্তিষ্কের ভেতর ঢুকে গেছে আমরা পরীক্ষা দেবো না সুতরাং আর কি আমাদের পড়া হয়! শিমুকে তার হল পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আমার হলে চলে এলাম।

রুমমেটদের নানান রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে ভেবে সন্ধ্যার দিকে একটু টেবিলে বসলাম। এমন সময় সন্ধ্যা সাতটার দিকে নিচ থেকে আমার কল এলো। আমি কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গেলাম। রাত করে কোন মহিলা গেস্ট এলো আমার কাছে? কৌতূহল নিয়ে তড়িঘড়ি করে নিচে নেমে দেখি শিমু লাল পাড় দেয়া শাদা রঙের একটা শাড়ি পরে সোফার এক কোণায় বসে আছে। তার হাত ভর্তি কাচের চুড়ি। তার গেটআপ দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা থাকলো না। আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, কি রে শিমু, তুই এ সময়?

শিমু কোমল গলায় বললো, তুমি কি তৈরি হয়ে এসেছো?

শিমু আমাকে তুমি করে বলছে দেখে আরো বিস্মিত হয়ে বললাম, তৈরি হয়ে আসবো মানে, কোথায় যাবো আমরা?

শিমু বললো, না না এমনিতেই, কোথাও যাবো না, আশেপাশেই ঘুরবো।

তখন ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি। মাঝারি ধরনের শীত। গরম কাপড়ের ওপর একটা চাদর জড়িয়ে নিয়েছিলাম। শীতে আমার সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

শিমু আমার দিকে অনুপুঙ্খ তাকিয়ে বললো, ঠিক আছে, এতেই চলবে, চলো।

বাইরে গিয়ে আমি রিকশা নিতে চাইলাম। শিমু বললো, রিকশা নিতে হবে না, আমরা হেটে হেটেই যাবো।

আমি আর প্রতিবাদ করিনি।

সূর্য সেন আর ইন্টারন্যাশনাল হস্টেলের কোণা ছাড়িয়ে মল চত্বরের মধ্যে পড়তেই শিমু মোলায়েম কণ্ঠে বললো, শাড়িতে আমাকে একদম ভালো লাগছে না, না?

এই রে! একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। সত্যিই তো! শিমুকে শাড়িতে অপূর্ব লাগছে। এটা আমার আগেই বলা উচিত ছিল। বললাম না, সত্যিই খুব সুন্দর লাগছে।

শিমু আদুরে গলায় বললো, তাহলে একবারও আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলে না কেন?

এবার সত্যি সত্যিই আমি বড় ধরনের একটা হোচট খেলাম। শিমুর কি হয়েছে আজ? ওর মাথা ঠিক আছে তো? শিমুর সঙ্গে তো আমার সে ধরনের সম্পর্ক না। সে আমার খুব ভালো একজন বন্ধু। তাই বলে তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরতে হবে কেন?

আমার নির্লিপ্ততা দেখে বিস্ফারিত চোখে শিমু আমার দিকে তাকালো।

তার প্রত্যাশাপূর্ণ সেই দৃষ্টিকে আমি আর উপেক্ষা করতে পারলাম না।

সত্যি সত্যি পেছন থেকে তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম। তারপর হাটতে হাটতে রাস্তা ছেড়ে ঘাসের মধ্যে এসে দাড়ালাম। শিমুর সামনাসামনি দাড়িয়ে তার দুই বাহু ধরে মাঠের মধ্যে এক জায়গায় দাড় করালাম। আমার মনের মধ্যে হাজার হাজার জোনাকি কিলবিল করছে একের পর এক।

আঙুরের থোকার মতো ঝুলতে থাকা শিমুর চুলের মধ্যে আমার আঙুল ডুবিয়ে দিলাম। আলতো করে ঠোট ছোয়ালাম তার কপালে ও ঠোটে।

এক সময়ে আস্তে করে নিজেকে সরিয়ে নিল শিমু। তারপর আমার শরীর থেকে প্রায় খুলে যাওয়া চাদর গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে শাসনের সুরে বললো, এখন পর্যন্ত চাদরটাও ঠিক করে পরতে পারে

না। বুঝেছি, আমার কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। একজনকে গুছিয়ে দিতে দিতেই আমার অর্ধেক জীবন যাবে।

আমি মোহাবিষ্টের মতো হয়ে গেলাম। শিমুর সব কথাই ম্যাডোনার গান হয়ে বাজলো, নানান সব প্রলাপও।

আমরা হাটতে হাটতে কলাভবনের সামনের লনের চারদিকের বেদির ওপর গিয়ে বসলাম।

শিমু এক সময় গম্ভীর হয়ে বললো, তোমাকে এখন একটা খুব সিরিয়াস কথা শোনাবো, প্রস্তুত হও। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে লাজুক হেসে বললো, কি রেডি তো?

বললাম, হ্যা রেডি, বলে ফেল।

শিমু কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে মাটির দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে রইলো। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে শুরু করলো, রাসেল আমি দেখেছি তুমি সত্যিকারেই আমার খুব বড় একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। তুমি আমার জন্য অনেক বড় স্যাকৃফাইস করতে পারো যা আর কেউ পারে না। রাসেল, তোমাকে ছাড়া আমি বাচতে পারবো না, আমি তোমাকে ভালোবাসি। প্লিজ তুমি আমাকে ফেরাবে না।

ঘটনার আকস্মিকতায় সত্যিই বিহ্বল হয়ে পড়লাম। এখন আমাকে কি করতে হবে? আমিও শিমুকে ভালোবাসি। কিন্তু মরে গেলেও এখন আমি এ কথা বলতে পারবো না। অনেক সময় স্ল্যাং কথা বলতেও আমার লজ্জা করে না। কিন্তু এ মুহূর্তে ভালোবাসি এ কথাটা বলতে লজ্জা, সংকোচে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। আমি মাথা নিচু করে শিমুর একটা হাত আমার হাতের মধ্যে নিয়ে অস্থিরভাবে বার বার ঠোটের সঙ্গে ছোয়াতে লাগলাম।

এরপর আর কিছু বলার সুযোগ আমাকে সে দেয়নি।

বুঝে নিয়েছিল ভালোবাসার নীরব ভাষা।

পরম নির্ভরতায় আমার কাধে মাথা রেখে সে ধরা গলায় বললো, এতো ভালোবাসা কোথায় থাকে, হ্যা?

সহসা আমার মনে একটু দুষ্টুমি ঝিলিক দিয়ে গেল। বললাম, শুনেছি তো বুকের মধ্যে থাকে। তোমার ব্লাউজ খুললে দেখা যেতে পারে।

আমার বুকে দ্রুত কিল মারতে মারতে শিমু বললো, খালি শয়তানি, খালি শয়তানি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা থেকে

অজানা

– ফয়সাল রহমান

আমার ছোট মামার বিয়ে। সারা বাড়ি জুড়ে মহাধুমধাম। দিনটা আমার পরম আনন্দেই কাটলো। কিন্তু রাতটা আর কাটতে চায় না। শীতের রাত, অথচ সর্বত্র নো ভেকেন্সি। এ বাড়িতে ছোট মামার রুমেই সাধারণত আমি ঘুমাতাম। আজ যেহেতু তার বিয়ে সেহেতু একটা উপায় হয়েও যেতে পারে।

আস্তে করে ঘরে ঢুকে পড়লাম। চেপে দেয়া দরজায় খিল এটে দিলাম ভালোভাবে যেন কেউ আর বিরক্ত না করে। বিছানায় হাতড়িয়ে বুঝলাম, একটি লোক খুব আরামে ঘুমিয়ে আছে। আমি তার লেপের অর্ধেকটা শেয়ার করলাম। লোকটি কোনো আপত্তি করলো না। বিছানায় দ্বিতীয় কোনো বালিশ ছিল না। তাই চেষ্টা করলাম তার বালিশে আমার মাথাটার একটা ব্যবস্থা করতে। এবার লোকটি নড়েচড়ে পাশ ফিরে শুয়ে থাকলো। বুঝলাম এর বয়স আমার থেকে মোটেও বেশি নয়, বরং একটু কম। মাঝ রাতের দিকে ছেলেটি আমাকে যেন লতাপাতার মতো জড়িয়ে ফেললো।

শীতের রাতে এভাবে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকার আলাদা একটা মজা আছে। তার দেহের উত্তাপে আমিও উত্তপ্ত হয়ে গেলাম। বেশ আরাম বোধ হচ্ছিল তখন। টের পেলাম শেষ রাতে ছেলেটি একবার বিছানা ছেড়ে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি ফিরে এসে আবারও শুয়ে পড়লো আমার পাশে। কিন্তু আগের মতো আমাকে আর তার বাহুবন্ধনে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রাখলো না। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি ছেলেটি আমার পাশে নেই।

লেপ সরাতেই বেরিয়ে পড়লো একটা জর্জেটের ওড়না!

বার বার হিসাব করতে লাগলাম সেই দরজায় খিল দেয়া থেকে শুরু করে মধ্যরাত, শেষ রাত এবং অবশেষে এই ভোরবেলা পর্যন্ত। কিন্তু কোথাও এর কোনো সমাধান খুজে পেলাম না। হঠাৎ দেখি, এক ষোড়শী দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে অনাদৃত ওড়নাটা কুড়িয়ে আপন উত্তাল উন্নত বক্ষের ওপর ছড়িয়ে দিল।

বললো, আমি নূপুর।

আমার নাম বলতে গেলাম।

কিন্তু সে হাত নেড়ে আমাকে থামিয়ে দিল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, তুমি খুব ভালো ছেলে, খু...ব। রাতে বোধহয় ঘুমটা বেশ সুবিধার হয়নি, তাই না? এই বলে সে এক ধরনের বিশেষ হাসি হাসলো যা বিশেষ অর্থ বহন করে। তারপর সে চলে গেল।

কিন্তু আমার মনটাও যেন তার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো। আমাকে রহস্যের অথৈ সাগরে সে ফেলে দিল আর আমিও ডুবে ডুবে সেই রহস্যময়ীর সন্ধান করতে লাগলাম। সারা সকালে তাকে আর খুজে পেলাম না।

অবশেষে নিরস্ত হয়ে বিষণ্ন মনে পুকুর ঘাটে গিয়ে বসলাম। হঠাৎ কুয়াশায় চাদর মুড়ি দিয়ে সেই সুহাসিনী কাছে এসে বললো, আমার মা হয়তো এতোক্ষণ বাসস্টপে পৌছে গেছে। আমি তোমাকে এঘর-ওঘর খুজে মরি। মেয়েমানুষ, সবার কাছে তো তোমার সন্ধান নিতে পারি না। লজ্জা করে, বুঝলে না? এই বলে সে একটু শব্দ করে হাসলো। হাসি থামিয়ে আবার বললো, দুঃখ হতে লাগলো। যাবার বেলায় তোমার দেখা পাবো না। অবশেষে একটা পিচ্চিকে চকলেট খাওয়ানোর চুক্তি করলাম। আমাকে সে-ই তোমার সন্ধান দিয়েছে।

সে আবারও একটু হাসলো। কিন্তু এ হাসি বড় ব্যথায় ভরা, দেখলে কান্না পায়। ধীরে ধীরে সে গম্ভীর হতে লাগলো। গলার কণ্ঠস্বরেও তার পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমি চলে যাচ্ছি, চিঠি দিও।

এবার সে অশ্রুজল গোপন করতে মুখটাকে আড়াল করলো। পাছে আমার চোখে তা ধরা পড়ে এই শংকায় সে দ্রুত পায়ে আবারও কুয়াশার মাঝে হারিয়ে গেল। নূপুর চলে গেল। আমার বুকের ভেতরটায় যেন নিরাশার বেদনা মোচড় দিয়ে উঠলো। তার ঠিকানাটা তো জানা হলো না।

ফকিরহাট, বাগেরহাট থেকে

দশ টাকার নোট

– এস.এম. সোহেল রানা খোকন

আমরা চার বন্ধু মিলে প্রেস ক্লাবে *মৌসুমী রেস্টুরেন্ট*–এ চা খেয়ে বিল দিতে গিয়ে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো। সবাই বিল দিতে চাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হলো, আজকের বিলটা আমিই দেবো।

পঞ্চাশ টাকার নোট দিলাম। ক্যাশিয়ার আমাকে দশ টাকার একটা নোট ফেরত দিল। দশ টাকার নোটটা হাতে নিয়ে দেখলাম একটি মেয়ের নাম লেখা। লেখা ছিল, *সাহসী প্রেমিক চাই মোসাঃ জলি,* বিস্তারিত ঠিকানাসহ বরিশাল থেকে।

চার বন্ধু মিলে আবারও দশ টাকার নোটটি নিয়ে শুরু হয়ে গেল কাড়াকাড়ি। এক বন্ধু প্রস্তাব দিল চারজনের নাম লিখে লটারি টানা হবে যার নাম উঠবে সেই পাবে দশ টাকার নোটটি। সবাই প্রস্তাবে রাজি হয়ে লটারি টানা হলো। নাম উঠলো বন্ধু ইমরানের। দশ টাকার নোটটি ইমরানকে দিয়ে দিলাম।

পরের দিন ইমরান এসে বললো, দোস্ত, জলির কাছে চিঠি দিয়েছি।

আমরা বন্ধুরা মিলে ইমরানের সঙ্গে রসিকতা করলাম এবং সেই থেকে ইমরানকে *সাহসী প্রেমিক* নামে ডাকতে শুরু করলাম। তার এক সপ্তাহ পরে ইমরান আড্ডাখানায় এসেই খুব মুড নিয়ে আমাদের সামনে একটি হলুদ খাম ফেলে বললো, দেখো শালারা, আমি সাহসী কি না?

আমরা খাম হাতে নিয়ে হতবাক।

একি!

জলির চিঠি!

চিঠি হাতে নিয়ে পড়লাম।

প্রিয়তমা, সত্যিই তুমি সাহসী এবং সৎও বটে। আমি দীর্ঘ আঠারোটি বসন্ত পার করলাম। এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারে পদার্পণ করেছি। দেখতেও আমি খুবই সুন্দরী এবং রূপসী। ক্ষেত এবং খ্যাতি দুটোই আছে। বাবা ইউপি চেয়ারম্যান। কিন্তু আমি রাগী এবং জেদি। এ জন্যই হয়তো কোনোদিন কোনো পুরুষ আমাকে প্রেম নিবেদন করার সাহস পায়নি। তবে একবার আমাকে যে কোনো পুরুষই দেখে মনে মনে পৃথিবীর সব কিছুর বিনিময়ে আমাকে পেতে চায়। কিন্তু আমার ভয়ে সামনে এসে কেউ বলতে পারে না। আমার বিস্তারিত জানালাম। সৎ সাহস থাকলে আবেদন করো, আমার হৃদয় মন্দিরে বিনা পরীক্ষায় ভর্তি করে নেবো। –ইতি জলি

ইমরান বললো, দোস্ত, একটা আবেদন পত্র লিখে দে।
লিখলাম। নাম ইমরান শেখ, পিতা...। বাংলাদেশ সচিবালয়ের গ্র্যাজুয়েট অফিসার।... বিস্তারিত।
তার সপ্তাহ খানেক পর আবার জলির উত্তর, প্রিয়তমা, তুমি কানা হও, খোড়া হও, দেখতে কুশ্রী হও তবুও প্রস্তুত থেকো আমি আসছি।
ভাবলাম, মেয়েটির দুষ্টুমি ছাড়া আর কিছুই না।
গত অক্টোবর মাসের ৪ তারিখ শুক্রবার বিকেলে আমরা চার বন্ধু বসে গল্প করছি। এমন সময় ইমরানদের বাড়ির ভাড়াটিয়ার ছেলে আট বছরের জুয়েল এসে আমাদের বললো, সোহেলভাইয়া, ইমরান ভাইদের বাসায় খুব সুন্দরী একটি মেয়ে এসেছে বরিশাল থেকে। হাতে অনেক বড় একটি লাগেজ।
ইমরান শুনে ভয়ে কাপতে শুরু করলো আর আমরা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম।
ইমরান আমাকে বললো, সোহেল, আমাকে তুই রক্ষা কর। না হলে বাবা মা আমাকে বাড়ি ছাড়া করবে।
শেষমেষ হাজির হলাম ইমরানদের বাড়ির আদালতে। ইমরানের বাবা হলেন জজ, আমাকে হতে হলো উকিল, জলি ফরিয়াদি আর ইমরান হলো আসামি। ইমরানের মা হলো জলির উকিল। তুমুল হট্টগোল।
জলি কান্না জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলো, বাবা, আপনি আমাকে মেরে ফেললেও এ বাড়ি ছেড়ে যাবো না। আমার বাবা মাকে ছেড়ে এসে আপনাদের পেয়েছি। আপনারা আমাকে ইমরানের সঙ্গে বিয়ে দিতে আপত্তি করছেন কেন? আমি কি দেখতে খারাপ?
জলি ছিল টইটুম্বুর রসে ভরা এক রূপসী। রাজকন্যা। অষ্টাদশী জলির যৌবন উপচে পড়ছিল। অবশ্য ইমরানও দেখতে রাজপুত্রের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।
দুই তিন দিন বোঝানো হলো। কোনো লাভ হলো না। ইমরানের বাবা বললেন, চলো মা, আমি নিজে গিয়ে তোমার বাবার কাছে দিয়ে আসি।
জলি নাছোড়বান্দা।

ইমরানদের বাসায় বসে চা খাচ্ছিলাম। এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠলো। কাজের মেয়ে দরজা খুলতেই বয়স্ক এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলো, এটা কি ইমরানদের বাসা?
মেয়েটি বললো, *হ চাচা, কারে চান?*
এখানে কি একটা মেয়ে এসেছে?
আপনে জলি আফার কথা কন। আহেন, ভিতরে আহেন। এমরানভাইয়া, দেহেন কেডা আইছে।

সামনে আসতেই ভদ্রলোক চেচামেচি শুরু করলেন। আপনারা আমার মেয়েকে আটকে রেখেছেন, আমি পুলিশে কেস করবো। আমি একজন চেয়ারম্যান। আমি আপনাদের দেখে ছাড়বো ইত্যাদি।

কথাতে বুঝলাম তিনিই জলির বাবা। চেয়ারম্যান চাচাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে নিয়ে বসলাম। সব কিছু শোনার পর ভদ্রলোক শান্ত হলেন, খাবার খেলেন। পরে বললেন, আমি তিন চার দিন যাবৎ সব জায়গায় খুজে না পেয়ে শেষে তার ডায়রিতে দেখলাম লিখেছে, বাবা, আমি আমার স্বামী ইমরানের ঘরে যাচ্ছি। সেই ঠিকানা অনুযায়ী এসেছি। বাবারা, আমার অবুঝ মেয়ের আচরণে মনে কিছু নিও না।

জলির সঙ্গে তিনি কথা বললেন। শেষে ঠিক করলেন, রাতে জলিকে নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবেন। আমাদের মনটা আরো বেশি খারাপ হয়ে গেল।

জলি কাদতে কাদতে বললো, সোহেলভাইয়া আমি আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি।... জীবনে আর বিয়ে করবো না।

সন্ধ্যায় ইমরানের বাবা ঘরে ঢুকতেই চেয়ারম্যানকে দেখে জড়িয়ে ধরে বললেন, আরে বন্ধু, এতো দিন পরে তুই আমার বাড়িতে? চিনলি কিভাবে? কেমন আছিস?

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

চাচা আমাকে বললেন, সোহেল উনি আমার পুরনো বন্ধু, এক সঙ্গে লেখাপড়া করেছি। প্রায় বিশ বছর পরে দেখা। সব কিছু জানার পরে চাচা বললেন চেয়ারম্যানকে, শালা, তোমার মেয়েকে আমি রেখে দিলাম। পারলে পুলিশ নিয়ে এসো।

চেয়ারম্যান বললেন, হ্যা অবশ্যই আনবো, এখনই আনবো, তবে পুলিশ নয় কাজি।

সকলে মিলে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলাম। ইমরান জলির বিয়ে হয়ে গেল।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

ছক্কা ও লজ্জা

– স্বর্ণা

আজ সকাল থেকেই শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। কেমন যেন অস্বস্তিকর জ্বর জ্বর ভাব, সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম মাথা ব্যথা। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু উপায় নেই। ইউনিভার্সিটিতে যেতেই হবে। খুব ইমপরটেন্ট দুটো ক্লাস আছে।

কোনো রকমে বিছানা ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিলাম। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে বাইরে বের হওয়ার সময় মা ডাক দিয়ে বললেন, স্বর্ণা, তাড়াতাড়ি চলে আসবি। অসুস্থ শরীরে দেরি করিস না।

ডিপার্টমেন্টে পৌছে মেজাজটা বিগড়ে গেল। অসুস্থ শরীর নিয়ে যে ক্লাস দুটো করার জন্য এসেছিলাম শুনলাম তার একটাও হবে না। আজ আরবি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমাদের কৃকেট খেলা। খেলা দেখতে সবাই যাতে জগন্নাথ হলের মাঠে যেতে পারে সে জন্য আজ কোনো ক্লাসই হবে না।

চুপচাপ গিয়ে লাইব্রেরিতে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরই জিনিয়া, লাবনী আমাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল। বললো, চল সবাই খেলা দেখতে যাচ্ছে। ক্লাসের গাধাগুলোকে উৎসাহ না দিলে তো একটা রানও করতে পারবে না। বলে রাখা ভালো, প্লেয়ারদের মধ্যে রনি, রাজ্জাক, সবুজ,

জিন্নাহ, টুটুল এই পাচজন হচ্ছে আমাদের ইয়ারমেট। আমার কোনো বাধাই তারা মানলো না। জোর করে টেনে নিয়ে চললো।

সবাই মিলে ডিপার্টমেন্টের খেলা দেখতে যাচ্ছি। বেশ একটা উৎসব উৎসব ভাব। আরবির ছেলেমেয়েরা বসেছে গ্যালারির পূর্বদিকে আর আমরা পশ্চিমে। চিৎকার, চেচামেচি, টিজ করায় কেউ কারোর চেয়ে কম যায় না। কিছুক্ষণ পরই খেলা শুরু হয়ে গেল। প্রথমে বোলিং করতে নেমে আমাদের দলের রনি আর রাজ্জাক বোলিং শুরু করলো। দেখা গেল আরবির ব্যাটসম্যানরা সমানে দুটোকেই পেটাচ্ছে। উচিত শিক্ষা হচ্ছে। বোলিং না পারলে আবার বোলিংয়ের শখ কেন। এভাবে পেটাতে থাকলে রান কতো হতো আল্লাহ মালুম। কিন্তু অন্যেরা ভালো বোলিং করায় শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে তাদের রান গিয়ে দাড়ালো ১১৭।

বিরতির পর আমাদের ব্যাটসম্যানরা ব্যাটিংয়ে নামলো। খেলা এগিয়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের রান আর এগোচ্ছে না। দশ ওভার শেষে রান উঠলো ২ উইকেটে মাত্র ৪০। আরবির ছেলেমেয়েদের চিৎকার, কটূক্তিতে টেকা দায়। এদিকে শরীরটাও হঠাৎ খুব খারাপ লাগছিল। বাসায় যাবার জন্য উঠে দাড়াতেই লাবনী জোর করে আমাকে বসিয়ে দিল।

বললো, খেলাটা শেষ করে যা না। এক্ষুণি শেষ হয়ে যাবে।

স্কোর বোর্ড দেখে বুঝতে পারলাম আর আশা নেই। তিন ওভারে দরকার ৩৬ রান। এই মাত্র ৫ নাম্বার উইকেটটাও পড়লো। এখন ব্যাটিংয়ে নামছে রনি। ভর্তির পর থেকেই এই ছেলেটা আমার পিছু লেগে আছে। কখনো সরাসরি কিছু বলেনি। কিন্তু তার হাবভাব যা বোঝার তা বুঝে নিয়েছি। তাকে অতোটা পাত্তা দিই না সত্যি। কিন্তু সামান্য হলেও যে তাকে একটু পছন্দ করি সে কথা অস্বীকার করতে পারি না।

রনি খুব একটা ভালো ব্যাটিং করবে সেটা কেউই আশা করেনি। কিন্তু সে মাঠে নামার পরই পরিস্থিতি বদলে গেল। নেমেই পর পর দুই বলে দুটো চারের মার মারলো। রান তরতর করে এগিয়ে চলেছে। শেষ ওভারে দরকার হলো নয় রান। প্রথম বলেই রনি চার মারলো। দ্বিতীয় বল মিস করার পর তৃতীয় বলে আবার চার। দুই দলের স্কোর সমান। তিন বলে দরকার মাত্র ১ রান। আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্টে তখন রান রান বলে চেচাচ্ছে। বলছে ছক্কা মারো রনি, একটা ছক্কা মারো। কথাটা সে শুনতে পেয়েছিল কি না জানি না। পরের বলেই বিশাল এক ছক্কা মেরে বল মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিল। ১১ বলে ৩২ রান!

সব ছেলেমেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে মাঠে ঢুকে রনিকে কাধে তুলে নাচতে লাগলো। খুশিতে, উত্তেজনায় আমার ভেতরটা তখন টগবগ করে ফুটছিল। দূর থেকেই দেখলাম রনি এদিক–ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুজছে। আমাকেই কি, কে জানে? গ্যালারিতে সবাই ফিরে আসার পর আমি ভালো করে তার দিকে তাকাতেও পারছিলাম না। কোথেকে একরাশ লজ্জা এসে আমাকে গ্রাস করলো। জানি না এ লজ্জার উৎস কোথায়?

হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে দেখি, আমার দিকেই তাকিয়ে আছে রনি। চোখে চোখ পড়তেই সে সুন্দর করে হেসে ফেললো। লজ্জায় মাথা নিচু করলাম। আমার জ্বর তপ্ত চোখ থেকে দুই ফোটা অশ্রু ঝরে

পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। কারণ রনি যদি বুঝে ফেলে। বেদনা বা কষ্টের নয়, বরং এ অশ্রু আনন্দের, এ অশ্রু ভালোবাসার!

ঢাকা থেকে

নিংচু

– হাফিজ রশীদ

ছেলেবেলা থেকেই অনেক স্বপ্ন দেখতাম। অদ্ভুত সব স্বপ্ন। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে একটা দ্বীপ থাকবে। দ্বীপে থাকবে একজন সুন্দরী আর আমি। দুইজনে মিলেমিশে একটা জীবন কাটিয়ে দেবো। কিন্তু স্বপ্ন কি পূরণ হয়? তবুও মাঝে মধ্যে কিছুটা তার ছায়া পড়ে বৈকি।

১৯৯৬ সালে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে কক্সবাজার গিয়েছিলাম। আমাদের একজন প্রস্তাব রাখলো সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যাওয়ার। ওখানেই পরিচয় নিংচু–র সঙ্গে।

আমরা পাচজন যখন দ্বীপে পৌছালাম তখন সকাল সাড়ে দশটার মতো। নিংচু–রা সাতজনের একটা দল। নেপাল থেকে ঘুরতে এসেছে। দ্বীপে পাশাপাশি হাটছি। আমি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কোথা থেকে এসেছো?

তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি উত্তর দিল, নেপাল থেকে।

পরে জানলাম তার নাম নিংচু। আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল একটা অ্যাকসিডেন্টে। আমাদের বন্ধু রনী হঠাৎ করে আছাড় খেয়ে পায়ের নখ উল্টে ফেললো। রক্ত আর রক্ত। ফার্স্ট এইডের কোনো ব্যবস্থা নেই। নিংচুরা ব্যাগ খুলে ডেটল দিয়ে ধুয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল। এবং নিংচুর সঙ্গে পরিচয় হলো।

কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে মাইক্রো বায়োলজিতে অনার্স করেছে। বিয়ে করেছে বাংলার ছাত্র পার্থ রায়কে। তারা দুজনেই একটা স্কুলে পড়ায়। আমি খুজে পেলাম আমার শৈশবের হারিয়ে যাওয়া সুন্দরীকে। সারাটা দিন কাটলো নিংচুর সঙ্গে গল্প করে।

আমি খুব সহজে প্রেমে পড়ার মতো ছেলেও নই। একদিনে প্রেম হয়ে যাবে তাও নয়। তারপরও নিংচু–কে এখনো ঠিক ঠিক মনে করতে পারি। তার পনি টেল করা চুল, কালো টি–শার্ট, লাল রঙ–এর ব্রা–র স্ট্রপ, নীল জিনস, নখের ডগায় গোলাপি নেইল পলিশ। নিংচুর শেষ কথাটা আজও আমার মনে আছে। বিটিভি–তে প্রতি সপ্তাহে *ডালাস* দেখি। ডালাস দেখলেই তোমার কথা মনে পড়বে।

এখন বিটিভিতে ডালাস দেখায় না। নিংচুর হয়তো কোনোদিনও আমাকে মনে পড়ে না। নিংচুদের হয়তো এতো কিছু মনে রাখতে হয় না। আমি কোনোদিনও নিংচুকে ভুলবো না। এটা কি ভালোবাসা, নাকি ভালোলাগা?

রাজশাহী থেকে

বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা

– আলি হোসেন চৌধুরী

উপরের এই শিরোনামে বেইলি রোডের থিয়েটার পাড়ায় একটি নাটক মঞ্চস্থ হতো আশির দশকে। নাটকটি দেখিনি। তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানি না। তবে সঙ্গত কারণেই শিরোনামটিকে টেনে এনেছি আমার লেখায়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় *ভালোবাসা* শব্দটিকে নিয়ে গত তিন দশক ধরে নাড়াচাড়া করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, ভালোবাসা ভালো নয়, এটা এক প্রকার ক্যানসার যা যৌবনকে কুড়ে কুড়ে খায়। ভালোবেসে সার্থক হয়েছেন এ ধরনের যুগলের সংখ্যা আমাদের দেশে কম। বিদেশে প্রায় নব্বই ভাগ। তার কারণ হলো, বিদেশে একজন তরুণ বা তরুণী তার জীবনসঙ্গীকে বেছে নেয় হাই স্কুল থেকেই। সেই ভালোবাসাটা গড়ে ওঠে পরস্পরের সহঅবস্থানের প্রেক্ষিতে দীর্ঘ দিন জানা–চেনার ভেতর দিয়ে। আমাদের দেশে ভালোবাসা গড়ে ওঠে শুধু আবেগ থেকে। যখন আবেগ হারিয়ে যায় তখন ভালোবাসা আর খুজে পাওয়া যায় না।

আমার সতেরো বছরের প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, এই সুন্দর পৃথিবীতে প্রেমিক হিসেবে শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশি যুবকেরা আর প্রেমিকা হিসেবে অতুলনীয় ফিলিপিনো মেয়েরা। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

একজন কিশোর কখন কিশোরীকে বলে আই লাভ ইউ? যখন কিশোরটা তার দেহে সেক্স অনুভব করে। দেহে তৈরি হওয়া সেক্স অনুভূতি তাকে প্রেমিক হিসেবে তৈরি করে। সেক্সই ভালোবাসার আদি পিতা। কোনো এক কবির খেদোক্তি, *অতি সুন্দরী না পায় বর, অতি রাধুনী না পায় ঘর।* এই পাংক্তিমালা লিঙ্গান্তর হয়ে ধরা দিয়েছিল আমার তারুণ্যে। স্কুল, কলেজ জীবনে কোনো তরুণীর ভালোবাসা পাইনি। চালাক–চতুর সুন্দরী তরুণীদের টিকিটিও পেতাম না। কারণ আমি ছিলাম সুদর্শন। ঠিক ওয়াহিদ মুরাদের কার্বন কপি। পরিচিতজনেরা তাই বলতো। একটু লাজুক অপটু ভালোবাসার রাজ্যে আমাকে আরো কোণঠাসা করে রেখেছি। তারুণ্যের ভেতর জন্ম নেয়া সেক্সটা ছিল আমার নিয়ন্ত্রণে। একাকী অনুভূতিতে কতো সুন্দরী তরুণীদের নিয়ে স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু বাস্তবে পেতাম না কাউকেই।

ভালোবাসা পেতে ব্যর্থ, এই আমার জীবনে প্রথম প্রেম হয়ে ধরা দিল সিগারেট। তরুণেরা গোপনে প্রেম করে আর আমি গোপনে সিগারেটের সুধাপানে নিজেকে ধন্য করেছি। সিগারেটে টান দেয়ার আগে বলি, আই লাভ ইউ এবং কিস দিই একের পর এক। হালকা পাতলা নেশায় প্রলাপ বকি আই লাভ ইউ এস। মেয়েরা কেন আমাকে এড়িয়ে চলতো তা গভীরভাবে ভেবে দেখার মতো বুদ্ধি–শুদ্ধি সেদিন ছিল না। সুন্দরীদের বাদ দিয়ে কালো গোলাপের সন্ধানে নিয়োজিত হলাম। ভেবেছিলাম সহজেই পেয়ে যাবো। হলো না। সামনের দাত দুটো ফুলে ফেপে ওঠা ইন্দ্রানীকে (আসল নাম নয়) টার্গেট করলাম। পেয়ে গেলাম জীবনের চরম ও অপ্রিয় কথাগুলো।

ইন্দ্রানী বললো, আমি তো হিন্দু, তোমাদের মুসলমান মেয়েরা তোমাকে দেখলে পালিয়ে যায়।

কেন? সবিস্ময়ে প্রশ্ন রাখলাম।

তুমি অতিরিক্ত সুন্দর ও সুদর্শন এবং বড় লোকের ছেলে। মেয়েরা ভাবে এবং বলে, তোমার সঙ্গে প্রেম করলে তুমি তো বিয়ে করবে না। খেলে–খুলে ছুড়ে ফেলে দেবে তাই।

১৯৭৩–এর এক শীত বিকেলে ইন্দ্রানীর কাছ থেকে পেলাম জীবনের সবচেয়ে তিক্ত অথচ অসহনীয় মেসেজটি। সিগারেটের সঙ্গে প্রেমটা আরো গভীর হলো।

লাভ ইন সিঙ্গাপুর আশির দশকের একটি বাংলা সিনেমা। আমি দেখেছিলাম। কাহিনীর বিষয়বস্তু এখন ঠিক মনে নেই। তবে ছবিটিতে সিঙ্গাপুরের বিষয়াদি টানতে চেষ্টা করেছেন পরিচালক। ওই ছবিটি যারা দেখেছেন বা দেখেননি সকলের মনেই সিঙ্গাপুর সম্পর্কে ধারণা জন্মেছে। সিঙ্গাপুর মানেই লাভ, লাভ অ্যান্ড লাভ। সেক্স ফৃ কান্ট্ তাই না? আসলেও কি তাই? সিঙ্গাপুর সেক্স পে (Pay) কান্ট্, ফৃ নয়। এখানে ফৃ বলতে পাওয়া যায় আলো আর বাতাস। লাভ শব্দটা মনে এলেই প্রথমে পরখ করে নিতে হবে ম্যানিবাগে কতো ডলার আছে। ওই ডলারই নির্ণয় করে দেবে ভালোবাসার পাত্রীর যোগ্যতা। বাংলাদেশে প্রেমিকেরা ফুটো কড়ি খরচ না করে পৌছে যায় প্রেমিকার ঠোটে, আরো নিচে। বিনা পয়সায় ভালোবাসার স্বাদ–ঘ্রাণ নেয়ার সুযোগ এই বিশ্ব সংসারে কেবল বাংলাদেশেই রয়েছে। যাযাদির বিশেষ সংখ্যাগুলোতে প্রেম বিষয়ক যেসব লেখা পড়েছি তাতে দেখেছি কেবল সময় ব্যয় করে প্রেমিকের হাত চলে যাচ্ছে প্রেমিকার স্তনে অনায়াসে। সিঙ্গাপুরে এটা শুধু কল্পনাতেই ভাবা যায়, বাস্তবে নয়।

সেক্স ফৃ বলতে এখানে বোঝায়, প্রাপ্ত বয়স্ক নর–নারীর প্রকাশ্যে আলিঙ্গন, চুমু, ব্যস এ পর্যন্তই। এর বাইরে প্রকাশ্যে কেউ কিছু করতে গেলে আইনের জালে আটকে যাবে। অবিবাহিত প্রেমিকযুগলদের মিলনের জন্য গেলাং–এ রয়েছে শতাধিক উন্নত মানের হোটেল। যেখানে ঘণ্টা ভিত্তিতে রুম ভাড়া দেয়া হয়। সেক্সপাগল প্রেমিকেরা ওই সকল বৈধ হোটেলে যৌন কাজ সেরে আসেন। বিশাল বিস্তৃত হোটেল পাড়ায় রয়েছে নজরকাড়া হাজারো সুন্দরী পতিতাদের অবাধ বিচরণ। কোনো টানা হেচড়া নেই অথবা নেই কোনো দৃশ্যকটু ব্যাপার। যার যার পছন্দ মতো সুন্দরীদেরকে দরদাম করে হোটেল রুমে চলে যায়।

সমস্যা কেবল টিনএজারদের জন্য। বিপজ্জনক এই টিনএজারদের পুলিশ চোখে চোখে রাখে। এদের অবাধ মিলনক্ষেত্র হলো পার্কগুলো। কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া পুলিশ ওই সব পার্কে যায় না। স্কুল–কলেজ ফাকি দেয়া টিনএজাররা ওই পার্কেই প্রায় প্রকাশ্যে দিনের আলোতে সেরে নেয় তাদের যৌন চাহিদা। কে দেখলো বা কি বললো তা নিয়ে এদের মাথা ব্যথা নেই। প্রেমিক–প্রেমিকাদের নিবিড় মিলনের জন্য পার্কগুলোতে বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে শ্যাডো যা দিনের বেলায় দখলে থাকে টিনএজদের, বিকেলে বয়স্কদের। কেউ কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। দ্বন্দ্বময় পৃথিবীতে বুশের মিসাইল কোথায় কোন সাদ্দাম হোসেনকে তাড়া করছে সে খবর তারা রাখে না। প্রেমিকার নগ্ন স্তনের বোটায় মুখ রেখে তারা খোজে জীবনের পূর্ণতা, ঠোটে ঠোট রেখে ক্লান্ত ও তৃপ্ত হৃদয়ে একে অন্যকে বলে, আই লাভ ইউ।

এই নির্মল ভালোবাসা পেতে পুরুষকে ব্যয় করতে হয় সময় ও অর্থ এবং বাস্তবায়ন করতে হয় প্রতিশ্রুত বিয়ের। প্রেমিকার হাত ফসকে প্রেমিক পালিয়ে যাবে অথবা অন্য নারীতে আকৃষ্ট হবে এ

ধরনের সম্ভাবনা নেই। কারণ ওই নারীর হাতেই রয়েছে পুরুষটিকে জব্দ করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী আইন। বেআইনিভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে আইন এখানে প্রয়োগ হয় না।

আমার লেখার প্রথমেই বলেছিলাম বাংলাদেশিরা শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। এবার এ প্রসঙ্গে। সিঙ্গাপুরিয়ান মেয়েদের সঙ্গে কোনো বাংলাদেশির প্রেম করা আর আকাশের চাদ হাতে পাওয়া সমান। হৃদয়ের আবেগে স্থানীয় কোনো মেয়ে বলবে, আই লাভ ইউ এটা প্রায় অসম্ভব। সিঙ্গাপুরিয়ানরা কাউকে ভালোবাসার আগে প্রত্যক্ষ যাচাই করে নেবে তার আর্থিক সামর্থ কতোটুকু। বিত্ত আর প্রাচুর্য থাকলে প্রেমিকের গাল চাপা ভাঙা বা এক চোখ কানা, খোড়া–নুলা যাই হোক, অসম্ভব সুন্দরী মেয়েটি বলে উঠবে, আই লাভ ইউ। বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে আসা রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, আমলা বা শেখ পরিবারের সদস্য ছাড়া বাকি কারোরই বলার সাহস নেই স্থানীয়দের আই লাভ ইউ। এখানকার ভালোবাসার আদিঅন্ত পিতার নাম ডলার। স্থানীয় প্রবাদ *নো মানি, নো হানি।* টাকাও নেই, মধুও নেই।

সিঙ্গাপুরের দৈনিক New Paper–র ভাষ্য মতে, এখানে তিন লাখ আশি হাজার ফরেন মেইড বা গৃহপরিচারিকা কাজ করছে যাদের প্রায় ষাট ভাগ ফিলিপিনো, ত্রিশ ভাগ ইন্দোনেশিয়ান। বাকিরা থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা বা ইনডিয়ান মেয়ে। ফিলিপিনো বিবাহিতা বা অবিবাহিতা প্রায় পচানব্বই ভাগ মেয়ে প্রেম করে। প্রেমিক হিসেবে ফিলিপিনো মেয়েদের প্রথম পছন্দ বাংলাদেশি ছেলে। তাই দেখা যায় শতকরা আশি ভাগ ফিলিপিনো মেয়েদের হাত ধরে ঘুরছে বাংলাদেশি ছেলেরা। ইন্দোনেশিয়ান মেয়েদের প্রায় পঞ্চাশ ভাগের হাত রয়েছে বাংলাদেশিদের হাতে। প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে দেখা যায় গেলাং হোটেলগুলোতে উপচে পড়া বাংলাদেশিদের ভিড়। তিন থেকে ছয় ঘণ্টার জন্য রুম ভাড়া করে নিভৃতে ভালোবাসার সুধাপান করে। একটি বিষয়ে সকলেই তীক্ষ্ম নজর রাখে তা হলো গর্ভধারণ। ফৃ সেক্স চললেও গর্ভ নিরোধ করা জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী এখানে সহজলভ্য নয়। প্রাপ্ত বয়স্ক বিদেশিদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সংগ্রহ করতে হয় খুব চড়া দামে চোরা মার্কেট থেকে। বিকেলে এসব কপোত–কপোতিনিরা দল বেধে ঘুরে বেড়ায় মেরিনা বে, হ্যাটক্যাট, সি–বিচ, লাকি প্লাজা ও দর্শনীয় স্থানগুলোতে। দিন শেষে পকেট থেকে চিরতরে হারিয়ে যায় কমপক্ষে একশ ডলার। এ ধরনের অভিসার প্রতি মাসে দুইবার চলে এক একজনের।

এমনি করে বাংলাদেশের একটি ছেলে নিজ দেশে যৌনবাস তো দূরের কথা ন্যূনতম ভালোবাসাও পায়নি। গাল, চাপা ভাঙা কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত অর্ধ, অল্প বা অশিক্ষিত সেই ছেলে এখানে এসে সামান্য ইংরেজি শিখে নিয়ে এক সেরা নজরকাড়া সুন্দরী ফিলিপিনোর হাত ধরে বলছে, আই লাভ ইউ। সেও বলছে আই লাভ ইউ টু...। তারপর একে অন্যের ভেতর মিলে যাচ্ছে দ্রুত। বাংলাদেশে যেমন হাতেগোনা কিছু সুন্দরী মেয়ে রয়েছে যাদেরকে ভোগ করছে সমাজের উচ্চ বিত্তরা ঠিক তেমনি এখানে কিছু অসুন্দর মেয়ে রয়েছে যাদেরকে ভোগ করতে পারে যে কেউ। অনেক চায়নিজ ছেলেদের বলতে শুনেছি, কোন মোহে ফিলিপিনোরা বাংলাদেশিদের পেছনে যায়? প্রবাদে বলে, *প্রেমিকে–প্রেমিক চেনে।*

প্রায় সকলেরই জানা এইডস একটি মারাত্মক ব্যাধি। এইডসের কবলে পড়ে থাইল্যান্ড রেড লাইনে রয়েছে। পাশের দেশ কম্বোডিয়া, মায়ানমার এবং ইনডিয়া প্রায় রেড লাইনের কাছাকাছি রয়েছে।

ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়ায় রয়েছে এইডস–এর ছড়াছড়ি। এই সব রকমারি ভালোবাসার বাজারে অবাধে হানা দিচ্ছে *এইডস* নামে নীরব ঘাতক। কেউ জানে না কখন কাকে ছুয়ে বসে এইডস।
ভালোবাসার এ তরুণ যুবকেরা অনেকেই নিজের অজান্তে এইডস–কে সঙ্গী করে ফিরে যাচ্ছে প্রিয় বাংলাদেশে। বিয়ে করছে অবলা, নিরপরাধ একটি মেয়েকে। সেই মেয়েটিও স্বীকার হয়ে যাচ্ছে এইডসে। এদের দাম্পত্য মিলনে যে নিষ্পাপ শিশুটির জন্ম হলো সেও জন্মগতভাবে পেল মরণ ঘাতক এইডসকে। এমনি করে এইডস আসছে মধ্য প্রাচ্য, দূর প্রাচ্য, ইওরোপ আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে, এমনকি প্রতিবেশী দেশ ইনডিয়া থেকে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ উদাসীন। নীরবে–নিভৃতে দ্রুত প্রসার হচ্ছে মরণ ব্যাধি এইডস।
ছেলে এবং মেয়ের অভিভাবকরা এখন থেকেই সতর্ক হোন বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন। জেনে নিন, ছেলের রক্তে এইচআইভি পজিটিভ রয়েছে কি না। যদি না থাকে তাহলে বিয়ে দিন আপনার মেয়ের সঙ্গে। ভালোবাসার ফুলের গন্ধে ভরে উঠবে তাদের দাম্পত্য জীবন। ভালোবাসার এই দিনে আজ সময়ের একান্ত জরুরি দাবি, বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন।

সিঙ্গাপুর, থেকে

ময়ূখ

– কাকলি

ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের খুব ভালোবাসতাম। যেখানেই ছোট বাচ্চা পেতাম, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন তাকে আদর করতাম। কিন্তু অন্যদের বাচ্চা আদর করে ঠিক মন ভরতো না। কখনো বাচ্চার গার্ডিয়ানের ভয়ে আবার কখনো যদি কেউ ছেলে ধরা ভাবে সে ভয়ে ভালোভাবে আদর করতে পারতাম না। আবার দেখা যেতো কোনো বাচ্চা কোলে আসতে চাইতো না, কেউ কোলে এলেও আদর পছন্দ করতো না। তবুও ওদের কোলে নিয়ে আদর করতে পিছপা হতাম না। যখন এসব ব্যাপারে মন খারাপ হতো তখন ভাবতাম ইশ! যদি এমন একটা বাচ্চা পেতাম যাকে আমার মতো করে আদর করতে পারবো।
অবশেষে আমার ঘর আলো করে এলো ছোট, সুন্দর, ফুটফুটে, তুলতুলে, ছটফটে একটি শিশু। তার হাসি, কান্না, হাত–পা ছোড়াছুড়ি, হাগু–হিসি সবই খুব উপভোগ করি। তাকে যখন ইচ্ছা কোলে তুলে নিতে পারি, গাল টিপে দিতে পারি, চুমু দিতে পারি। আল্লাহর কাছে হাজার শোকর, সে আমাকে একটা ছোট শিশু দিয়ে দিয়েছে যে একান্তই আমার, যাকে প্রাণভরে আদর করতে পারি।
সব সময়ই সে আমার গা ঘেষে থাকে, লুটোপুটি, হুটোপুটি করে। এই শীতে সে ওমের জন্য আমার শরীরের ভাজে গুটিসুটি মেরে ঘুমায়। সে যখন মা ডাকে, ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিয়ে পাপ্পি দিই। সেও তার ছোট ছোট দুটো হাত দিয়ে আদর করে। তার লালা মিশ্রিত চুমু, কামড় আমার পুরো গাল জুড়ে। সেই ছোট শিশুটিই আমার ভালোবাসা, আমার আদর। সে আমার ছোট সোনামণি ময়ূখ, এক বছরের ছোট ময়ূখ।

শুধু আমার কেন, সব মায়েরই শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা তার সন্তান।

মাসকান্দা, ময়মনসিংহ থেকে

কমলা

– আশফাকুল জলিল

ভারতের উত্তরাঞ্চল প্রদেশের গঙ্গা তীরের শহর হরিদ্বার। সারা হিন্দুস্থান থেকে আসা অসংখ্য তীর্থ যাত্রীর আনাগোনায় সরগরম। শীতের সকালের মোলায়েম রোদে হাটতে গঙ্গা তীরের *হর কি পৌড়ি* ঘাটে এসে উপস্থিত হলাম। পুণ্যার্থীরা এই শীতের সকালেও মন্দির গমনের আগে স্নান সেরে নিচ্ছে। গঙ্গার এপারে মনসা পাহাড়, ওপারে চণ্ডি পাহাড়, দুই পাহাড়ের চূড়ায় দুই মন্দির।

রোপওয়েতে চড়ে মনসা পাহাড়ে উঠে গেলাম। অনেক পুরনো মন্দির তবে সর্বদা যত্নের ফলে ঝকঝকে, তকতকে, কাল এখনো মন্দিরের গায়ে তেমন কোনো ছাপ রাখতে পারেনি। কিছুক্ষণ ঘুরে–ফিরে মন্দিরের দেয়াল আর পিলারগুলোতে আকীর্ণ দেব–দেবীর মূর্তি দেখে ফিরতি রোপওয়েতে চড়ে এপারে এলাম।

আমার সামনের রোপওয়ে বাস্কেট থেকে এক বৃদ্ধ একটি তরুণীকে হাত ধরে নামালেন। তরুণীটি নেমেই কেমন যেন টলতে লাগলো। বৃদ্ধ তাকে বললেন, চলো, ওই বেঞ্চিটাতে বসে বিশ্রাম নেবে। শাড়ি পরা মেয়েটিকে ধরে সিমেন্টে বাধানো বেঞ্চিটিতে বসিয়ে দিলেন। তারপর টিশু পেপার দিয়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তার মুখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

বৃদ্ধের মুখে রংপুরের আঞ্চলিক টানের বাংলা শুনে এগিয়ে গেলাম। বললাম, রোপওয়ে থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখার ফলে বোধহয় বমির ভাব এসে গেছে। আমার কাছে পানি আছে, চোখে মুখে ছিটিয়ে দিলে তিনি ভালো বোধ করবেন।

ভদ্রলোক তাই করলেন। মেয়েটি একটু ধাতস্ত হয়ে মাথার ঘোমটাখানা ঠিক করে নিয়ে হিন্দিতে বললেন,মনে হয় তিনি তোমার দেশের লোক। ভদ্রলোক ঠিক তোমার মতো করেই কথা বলছেন।

বললাম, আমি তো পশ্চিমবঙ্গের লোক নই। আসলে বাংলাদেশের লোক।

বৃদ্ধ বললেন, আমিও তো তাই। কমলাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়াতে আপনার মুখে বাংলা শুনেও বিষয়টা খেয়াল করতে পারিনি। আমাকে তিনি তার পাশে বসার ইঙ্গিত করলেন। আমি বসতেই বললেন, প্রায় বছরখানেক দেশের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। এখানে বাংলাদেশের কোনো পত্রপত্রিকাও মেলে না। পশ্চিমবঙ্গের অল্প কিছু বাঙালি পরিবার আছে বটে কিন্তু তারা পাশের দেশের তো পরের কথা, পশ্চিমবঙ্গের খবরও রাখে না। হরিদ্বারে আছি এক বছর হলো, এই প্রথম দেশি লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। একটু কেশে নিয়ে বললেন, এ হলো কমলা, আমার স্ত্রী। আমরা এখন বাসায় ফিরবো, আপনিও আমাদের বাসায় চলুন না।

কমলা মুখ খুললেন এবং বললেন, শ্বশুরদেশের কাউকে কখনো দেখিনি, আমাদের সঙ্গে আপনি গেলে খুব খুশি হবো। স্বামীর দিকে চেয়ে আরো বললেন, তাছাড়া আপনার সঙ্গে ও গল্প করতে পারলে আনন্দিত হবে। দেশের কথা প্রায়ই বলে।

দুজনের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাদের সঙ্গে যাত্রা করলাম। হরিদ্বার শহরের পুরনো অংশের এক গলিতে তাদের ছোট বাসা। তিন রুমের বাসা। বাসার সামনের এক চিলতে জায়গাতে বগেনভিলার ঝাড়। দরজা খুলে সবাই ঘরে প্রবেশ করলাম।

ড্রইংরুমে আমাকে বসতে বলে কমলাকে নিয়ে বৃদ্ধ ভেতরে গেলেন। খানিকক্ষণ বাদে তিনি ফিরে এসে আমার পাশে বসলেন। বললেন, কমলা মেয়েটি বড্ড ভালো। আমাকে খুব যত্নে রেখেছে। বুড়ো বয়সে এতো যত্ন পাবো তা কখনো ভাবিনি। আমার বাড়ি রংপুর জেলায়। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে পিডাবলিউডি–তে চাকরি নিয়েছিলাম। গৃহায়ন পরিদফতরের ডিজি হিসেবে রিটায়ার করি। চাকরিতে বেশ আর্থিক উন্নতি হয়েছিল। ঢাকার গুলশানে একটি আর উত্তরায় দুটো প্লট করেছিলাম। সবগুলোতে বাড়ি করে ভাড়া দিয়ে মাসে বেশ বড় অংকের টাকা পাচ্ছিলাম। এলপিআর–এ যাবার ছয় মাস পরে স্ত্রী গত হলেন। ভীষণ একা হয়ে গেলাম। কাজকর্ম নেই, নিঃসঙ্গতার ফলে বড় হাপিয়ে উঠছিলাম। দুই ছেলে, এক মেয়ে পালা করে ওদের বাসায় রাখতো। কিন্তু ঢাকা শহরের ব্যস্ত জীবনে একজন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধকে দেখার সময় কোথায়।

কিছুদিন রংপুরে গ্রামের বাড়ি গিয়ে রইলাম। আমাদের ছোটবেলায় দেখা গ্রামের সেই সহজ সরল জীবন আর নেই। ভালো লাগলো না। ঢাকায় ফিরে হজ পালনের প্রস্তুতি নিলাম। হজে যাবার আগে শরিয়ত মোতাবেক যাবতীয় স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি বিলি–বণ্টন করে দিলাম। হজ পালন শেষে দেশে ফিরে বড় ছেলের বাসায় উঠলাম। কিছুদিন যেতেই বুঝতে পারলাম সহায়–সম্পদহীন বৃদ্ধের আত্মীয়তার দাবি বড় ঠুনকো। আমি ওদের পরিবারে যেন আমি একটা উটকো ঝামেলা।

মানসিক তৃপ্তি পেতে, সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের জমিয়ে বসা সংসারে আত্মমগ্ন হবার সুযোগ দিতে বছর দুই আগে লম্বা সময়ের জন্য ভারতে বেড়াতে এলাম। পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, আজমির, আগ্রা, জয়পুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ঘুরে বড় ভালো লাগলো। চাকরি জীবন ব্যস্ততায় কাটিয়েছি। মানুষ আর প্রকৃতির দিকে নজর দেয়ার সময় হয়নি। পর্বতমালা, মরুপ্রান্তর, শৈলশহর এবং নানান সংস্কৃতির মানুষ দেখে জীবনবোধ পাল্টে গেল। দেশে ফিরে এলাম। কিন্তু ঘোরার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে।

কয়েকদিন দেশে থেকে আবার নতুন নতুন জায়গা দেখার জন্য চলে এলাম। বছরখানেক আগে বিহার রাজ্য ঘুরে দেখার জন্য এলাম বিহার দরিদ্র রাজ্যে, বেশির ভাগ মানুষ নিরামিষভোজী, জীবনযাত্রা সরল আর শ্লথ। কিছুদিন পাটনায় থেকে বুদ্ধদেবের স্মৃতি বিজড়িত গয়া, বুদ্ধগয়া নালন্দা, বৈশালি ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করলাম। গয়া থেকে দক্ষিণে পদ্মা পাহাড়ি এলাকা।

গয়াতে হোটেলে থাকার সময় শুনলাম প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে খাড়খণ্ড আর বিহার রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত পদ্মায় মানুষ বেচাকেনার হাট বসে। খুব কৌতূহল হলো। খানিক পথ বাসে খানিক পথ হেটে হাজারিকা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাহাড়ঘেরা এক গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। কতোকগুলো পাহাড়ের মাঝের সমতল জায়গায় ঝরনার ধারে মানুষ বেচাকেনার হাট বসেছে। নানান

বয়সের মানুষ বিকিকিনি হচ্ছে মেয়ের সংখ্যাও কম নয়। পুরুষদের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা বুঝে মেয়েদের বয়স গায়ের রঙ এবং চেহারার লাবণ্যতা বুঝে দাম নির্ধারণ হচ্ছে।

হাটে খানিকক্ষণ ঘুরে–ফিরে এক দোকান থেকে চা পান করে ফিরে এলাম। সে সময়ে চোখ পড়লো একটা মেয়ের দিকে। বয়স বিশ বাইশ হবে, গায়ের রঙ কালোর দিকে। তবে চেহারা লাবণ্যময়, ভীত ডাগর ডাগর চোখ মেলে ঝরনার দিকে চেয়ে আছে। ওদিকে তাকে কেনার জন্য দরদাম হচ্ছে। ষণ্ডা মার্কা চেহারার এক লোক ষোল হাজার রুপি দিতে চাইছে মেয়েটির জন্য। কিন্তু ওর কাকা বিশ হাজারের কমে ওকে বেচবে না। রীতিমতো বচসা চলছে, আমি কাছে দাড়িয়ে শুনছি। শেষ দাম আঠারো হাজার রুপি বলে ষণ্ডা মার্কা লোকটা গজরাতে গজরাতে চলে গেল। স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে আছি। সংবিৎ ফিরলো মেয়েটির কাকার ডাকে।

তিনি বললেন, ও মশাই – আপনি নিকুন্তিলা–কে কিনবেন নাকি?

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। এই বিংশ শতাব্দীতে গোটা একটা মানুষ বেচাকেনা হয় তা আবার আমিই কি না তার ক্রেতা! এ রকম অবস্থা কল্পনাতেও কখনো ভাবিনি।

নিকুন্তিলা–র কাকা বলতে লাগলেন, বাপ মা মরা মেয়েটাকে বেচতে চাইনি। কিন্তু তিন বছরের খরায় কৃষিকর্ম বন্ধ, গরু–ছাগল তো বটেই ঘরের পেতলের থালা–বাটি পর্যন্ত বেচে দিতে হলো। নিজের ছেলে তিনটেকে খাবার দিতে পারছি না। শেষে ওর দাদি বললে, নিকুন্তিলাকে বেচে দিয়ে তোর বংশের বাতিগুলোকে বাচা। ও যেখানে যাবে, দুমুঠো খেয়ে বাচতে পারবে। এবং আমরাও এই দুর্ভিক্ষের সময়টা কোনোক্রমে পার করতে পারবো। তা মশাই, আপনি বৃদ্ধ মানুষ, দয়া–মায়া আছে বলে মনে হচ্ছে, যদি নেন তবে ওই আঠারো হাজারেই দেবো। ওই বদমাশটার কাছে বেচতে চাই না। এরা মেয়েদের নিয়ে খারাপ কাজে লাগিয়ে দেয় এবং নানান অত্যাচার করে।

ওদিকে নিকুন্তিলা আমার দিকে বার বার চাইতে লাগলো। তার দৃষ্টিতে করুণার প্রত্যাশা। হঠাৎ কি যে হয়ে গেল, সাতপাচ না ভেবেই নিকুন্তিলাকে কিনতে রাজি হয়ে গেলাম। সঙ্গে এতো টাকা ছিল না। নিকুন্তিলার কাকা সঙ্গে হোটেল পর্যন্ত এলো, তাকে টাকা দিয়ে বিদায় করলাম।

মেয়েটির কাকা চলে যেতেই বাস্তবে ফিরে এলাম। আমার মাথায় সহসা যেন বাজ পড়লো। এখন এই যুবতী মেয়েটিকে নিয়ে কি করি। একে নিয়ে তো দেশে ফেরার উপায় নেই। ও কেমন নিশ্চিন্ত মনে খাটের পাশে বসে আছে, ওকে নিরাশ্রয়ই বা করি কি করে। সারাটা সন্ধ্যা হোটেল রুমে ঝিম মেরে বসে রইলাম এবং থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলাম।

নিকুন্তিলা এতে কি বুঝলো কে জানে, সন্ধ্যার খানিক বাদে সে কাদতে কাদতে বললো, আমি মনে করেছিলাম আপনার সেবা করে জীবন কাটিয়ে দেবো। কিন্তু তাতে যখন অসুবিধা তবে আমাকে অন্য জায়গায় বিক্রি করে দিয়ে আপনার টাকা উঠিয়ে নিন।

ওর এ কথায় আমার মনে বড় আঘাত লাগলো। নিকুন্তিলাকে খাইয়ে হোটেলে তার জন্য অন্য একখানা রুম ঠিক করে দিয়ে নিজের রুমে ঘুমাতে গেলাম। তবে সারা রাত নানান চিন্তায় চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। শেষে ভোর রাতের দিকে মন স্থির হলো। ওকে শরিয়ত মতো বিয়ে করলাম। নিকুন্তিলার নতুন নাম দিলাম কমলা। এই বৃদ্ধ বয়সে তরুণী স্ত্রী নিয়ে তো দেশে ফেরা চলে না। শেষে ভারতেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে এলাম উত্তরাঞ্চল প্রদেশে।

ঢাকায় পোস্ট অফিসে বেশ কিছু টাকা রেখেছিলাম বিপদ–আপদের সময়ের জন্য। কমলাকে এখানে রেখে দেশে গিয়ে সেই টাকাটা নিয়ে এসেছি। ওই টাকায় এখানে নানান রকমের সরকারি বন্ড কিনে রেখেছি কমলার নামে তা থেকে মাসে মাসে যা পাওয়া যায় তাতে আমাদের দুজনের বেশ ভালোভাবেই চলে যায়। বুঝলেন মশাই, বিয়ের সময় কমলাকে বলেছিলাম, তুমি ইচ্ছে করলে তোমার নিজের ধর্মেই থাকতে পারো।

কিন্তু ও বললো, আপনি আমাকে চূড়ান্ত অসম্মানজনক জীবনের হাত থেকে বাচিয়েছেন, এখন আপনার যা ধর্ম আমারও তাই।

তা ও মুসলিম হয়ে গেল। ওকে নিয়ে বেশ আছি। ছেলেমেয়েদের বিরক্ত করতে হচ্ছে না। আমারও একজন সঙ্গী বড় দরকার ছিল, কমলা সে অভাব মিটিয়েছে। আপনি হয়তো মনে মনে পুরো বিষয় নিয়ে নানান অসঙ্গত কথা ভাবছেন। কিন্তু আপনি যখন বৃদ্ধ হবেন, স্ত্রীহারা হয়ে ছেলেমেয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা হয়ে যাবেন তখন আমার এ অবস্থাকে মোটেও অসঙ্গত ও অসমীচীন মনে হবে না। জানেন কি ভালোবাসা পেয়ে ধন্য হতে এবং ভালোবাসতে বয়স কোনো বাধা হয়ে দাড়ায় না। এটা আমি এখন মনে–প্রাণে বিশ্বাস করি। কমলাকে হয়তো ওর বয়সের চাহিদা মতো সুখ দিতে পারছি না। তবে সে খেয়ে–পরে সম্মানজনকভাবে নিরাপত্তার মধ্যে বেচেবর্তে তো আছে।

এই এক বছরের মধ্যে ওর মাঝে অসুখী হবার কোনো চিহ্ন দেখতে পাইনি। বুঝলেন মশাই, গরিব ঘরের মেয়ে তো! তাই খুব অল্পে তুষ্ট হতে শিখেছে, সব পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেয়ার গুণটাও পেয়েছে ওই দারিদ্রতার ভেতর থেকে। পড়াশোনা তো তেমন নেই। কিন্তু স্বামীকে কি করে সুখী রাখতে হয় তা বেশ জানে। আমার মতো এই রকম বুড়ো বয়সে চারদিকটা ফাকা হয়ে আসে। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা ছাড়া আর কি থাকে বলুন? কমলা আমাকে নতুন করে জীবন সুখী করেছে, এই বেচে থাকা বড় আনন্দের মনে হয়।

পর্দা সরিয়ে কমলা ঘরে আসেন। বললেন, আপনাদের খাবার দিয়েছি। হাত মুখ ধুয়ে খাবেন, চলুন। খেতে বসলাম। ভাত, দুই পদের নিরামিষ, মটরের ডাল আর মুরগির মাংস। ভাত দেখে ভালো লাগলো। এ অঞ্চলের তো চাপাতি, নিরামিষ ও ডালই প্রধান খাদ্য।

কমলা হেসে বললেন, আমি তো আমিষ খাই না। কিন্তু তিনি তো সারা জীবন মাছ মাংস খেয়েছেন। শুধু নিরামিষ আর ডাল নিশ্চয় ভালো লাগে না। তাই মাছ–মাংস রান্না করা শিখে নিয়েছি।

নানান কথায় খাওয়া শেষ হয়। বিকেলেই আমার মিসৌরি যাত্রার ট্রেন। আর দেরি করা চলে না, ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। বিদায়কালে বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করে বললাম, আপনার এবং কমলাদিদির যৌথ জীবন সুখের হোক এ কামনাই করি।

আমার এই কথায় তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, সুখেই আছি তবে আমার বয়স হয়েছে কদিন আর বাচবো, আমি গত হলে কমলার কি হবে ভেবে খারাপ লাগে।

কমলা পাশেই ছিলেন। বললেন, আমি না বারণ করেছি, আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে এতো না ভাবতে। আমার দিকে ফিরে বললেন, জানেন, এই লোকটি আমার পতিতালয়ে চালান হয়ে যাবার হাত থেকে বাচিয়েছেন। বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন, পোস্ট অফিসে আমার নামে সাত লাখ রুপি রেখেছেন যা দিয়ে এই গরিব দেশে আমি প্রায় রানীর হালে চলতে পারবো। তবু ওর উদ্বেগের শেষ নেই।

বৃদ্ধের আবেগ কমলার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে। কান্না লুকাতে তিনি আচলে মুখ ঢাকলেন। আমি তাদের আর বিব্রত না করে রাতে ট্রেনে খাবার জন্যে কমলাদিদির দেয়া টিফিন বক্সখানা তুলে নিয়ে রেল স্টেশনের দিকে চলা শুরু করলাম।

বরিশাল থেকে

দায়মুক্তি

– কল্যাণ রায়

মানুষের কতোগুলো স্মৃতি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। সেসব স্মৃতিকে বাদ দিলে জীবনের একটা অংশকেই বাদ দিতে হয়। এমন স্মৃতিময় কতোগুলো দিন আমার জীবনে নিয়ে এসেছিল আমার মেমসাহেব। শ্যামবর্ণের আমার মেমসাহেবের অদ্ভুত সুন্দর তার চোখ দুটো, ভ্রূ টানা টানা, ভেজা ভেজা ঠোট দুটি গোলাপি রঙের, দেহখানা ছিপছিপে দোহারা গড়নের।

সবেমাত্র এসএসসি পাস করে রংপুর পুলিশ লাইন কলেজে ভর্তি হলাম। থাকার ব্যবস্থা হলো ইসলামবাগের এক মেসে। মেসের পাশেই বন্ধু ফারুকের বদৌলতে ধনাঢ্য মেমসাহেবকে পড়ানোর দায়িত্বটা পাই। জীবনে কখনো কোনো মেয়েকে পড়াইনি। একটা শুভদিন দেখে মেমসাহেবকে পড়ানো শুরু করলাম। আমাদের বসার ব্যবস্থা করা হলো দ্বিতীয় তলার একটা নির্জন রুমে। পড়াতে গিয়ে প্রায়ই দেখতাম, মেমসাহেব হা করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিতাম। তারপর আমার জন্মদিনে সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ দিল মেমসাহেব।

আমার হাত জড়িয়ে ধরে বললো, স্যার, আমি আপনাকে ভালোবাসি, আমি আপনাকে ছাড়া বাচবো না।

হতবাক হলাম মেমসাহেবের খামখেয়ালিপনা দেখে। সেদিন না পড়িয়েই চলে এলাম মেসে। পরদিন খুব সকালে আমার রুমে এসে হাজির মেমসাহেব। ফোলা ফোলা চোখ দুটি দেখে সহজেই অনুমান করলাম নির্ঘুম রাত কেটেছে তার। আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না জুড়ে দিল সে।

কল্যাণ, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

এই প্রথম সে আমাকে তুমি ও নাম বলে সম্বোধন করলো। সেদিন তাকে না করতে পারিনি। জড়িয়ে গেলাম মেমসাহেবের ভালোবাসার জালে। এরপর থেকে আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত রুমটিতে চলতে লাগলো কিছু পড়ালেখা, কিছু আদর, কিছু ভালোবাসা। যতোক্ষণ পড়াই তারচেয়ে বেশি চলতে থাকে দুষ্টামি।

কখনো দেখা যায়, তার জামার পেছনের বোতাম ইচ্ছা করে সে খুলে ফেলে লাগানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে। শেষে আমাকে বলে, বোতামটা লাগিয়ে দাও তো।

সেই সুবাদে তার মোলায়েম ঘাড়ে হাত বোলাই, সেক্সি সতেজ বুকও বাদ যায় না।

অনেক ক্ষেত্রে জোর করে পড়া তৈরি করে নিতাম। কোনোদিন পড়া তৈরি না করলে সেদিন ওকে আদর করতাম না।

কোনোদিন আদর না করলে বা মিথ্যা অভিমান করলে ও মেসে এসে আমার বেডে শুয়ে থাকতো যতোক্ষণ না আমি কথা বলি।

তবে ও আমার রুমে এলে কথা না বলে থাকতে পারতাম না। প্রায়ই ওর ওপর শুয়ে থাকতাম।

মেমসাহেব নিজেকে সামলে নিয়ে বলতো, শুধু শুধু শুয়ে থাকবে, একটুও দুষ্টামি নয়?

ওর কথার অন্যথা করার জো ছিল না। একটু অন্যথা হলেই ফোলা ফোলা চোখ দুটি দিয়ে নামতো বৃষ্টির ফোয়ারা। তাই ওর বুকের মধ্যে মাথা রেখে শুধু বুকের ধুক ধুক শব্দই শুনতাম।

এভাবে কেটে গেল একটা বছর। একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মেমসাহেবকে আমার জীবন থেকে দূরে নিয়ে যায়। দিন যতোই গড়ায়, মেমসাহেবের পাগলামি ততোই বাড়তে থাকে। কারণে–অকারণে চুমু খাওয়া, আমাকে জড়িয়ে ধরা তার একটা বাতিক হয়ে গেল।

একদিন ওর জেদাজেদিতে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম ওর মায়ের কাছে। মেমসাহেব দ্রুত আমাকে ছাড়িয়ে নিচে নেমে গেল। আমি থ হয়ে গেলাম।

আন্টিকে যতোটা কঠিন, কর্কশভাবে আশা করেছিলাম ঠিক ততোটাই কোমল হয়ে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সবই আমার কপাল। তবে তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করতাম। তারপর একটা ছোট প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাবা, তুমি আর এসো না। আমি তোমার মায়ের মতো, আমার মাথা ছুয়ে তুমি কথা দাও, হ... জীবন থেকে তুমি সরে যাবে।

আমি সরে যাওয়ার অঙ্গীকার করে চলে এলাম?

এরপর মেমসাহেব ছাড়া আমার দিনগুলো কাটছিল খুড়িয়ে খুড়িয়ে। ও তেমন খবর নেয়ার প্রয়োজন মনে করলো না।

এভাবে কাটলো পাচটি মাস। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় আমার মেসে এসে হাজির মেমসাহেব। রুমে এসেই দরজা বন্ধ করে দিল সে। আমার আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, কেমন আছো কল্যাণ?

বেশ তো আছি।

তুমি কি জানো কাল আমার বিয়ে?

কি বলছো মেমসাব। বিয়ে তোমার? কার সঙ্গে?

চাচাতো ভাই কামরুলের সঙ্গে। মেমসাহেবের চাচা সপরিবারে আমেরিকা যাচ্ছেন স্থায়ী ভিসা নিয়ে। চাচার ইচ্ছা, মেমসাহেবকে তার পুত্রবধূ করার। তাই আপাতত বিয়েটা আকদ করে রেখে সুবিধা মতো সময়ে তুলে মেমসাহেবকেও আমেরিকা নিয়ে যাবেন।

মেমসাহেবের ভাগ্যের তারিফ করে চুমু দিতেই সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো। নিজের পাজামাটা খুলে ফেলে আমাকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে বিছানায় নিয়ে গেল।

এসব কি করছো তুমি মেমসাহেব?

দোহাই কল্যাণ, তুমি না করো না। আমাকে দায়মুক্ত হতে দাও। অন্তত একবার আমাকে মরতে দাও।

আমি না করতে পারিনি। নিজের অজান্তে ওর ঠোটে ঠোট লাগাই। ভালোলাগার শিহরণে আমার সমস্ত শরীর কেপে উঠলো। দ্রুত দেখে নিলাম তার রূপের অপরূপ মাধুর্যকে। তারপর নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম অতল তলের আহ্বানে। সব কিছু উজাড় করে নিয়ে তাকে দায়মুক্ত করলাম।
আমাদের ভালোবাসার শুরু করেছিল মেমসাহেব, শেষও সেই করে দিল। আমার আর চাওয়া–পাওয়ার কিছুই থাকলো না।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে

এসিড

– সবুজ

বোতলটা ঠাস করে টেবিলের ওপর রাখলো। ধপাস করে বসে পড়লো সে চেয়ারে। মাথার চুলগুলো এমনভাবে টানা শুরু করেছে যেন এখনি সবগুলো চুল ছিড়ে ফেলবে।
এই, তোর কি হয়েছে রে? এমন করছিস কেন?
কোনো কথা বললো না রবি।
জোরে সোরে একটা ধাক্কা দিয়ে বললাম, কি হয়েছে তোর?
কিছু না।
কিসের কিছু না, কি হয়েছে বল, হালকা ধমক দিলাম।
বললাম না কিছু হয়নি। ও যেন জ্বলে উঠলো।
বুঝলাম আগুনে এবার পানি ঢালতে হবে। নরম গলায় বললাম, দোস্ত, তোর কি হয়েছে বল আমাকে, বল না।
আমি ওকে ছাড়বো না। ওর রূপের অহংকার শেষ করে দেবো। বোঝলাম রবি ওর প্রেমিকার কথা বলছে। এই, কি বলছিস তুই এসব? কি করেছো সে তোর সঙ্গে?
তুই জানার চেষ্টা করিস না। বলতে পারবো না। আমাকে এখন বিরক্ত করিস না তো যা।
ঠিক আছে, না হয় না বলবি। তুই মাথা ঠাণ্ডা কর। সিগারেটটা দাতে কামড়ে ধরে একদৃষ্টিতে গ্যাস লাইটটার দিকে তাকিয়ে একবার জ্বালাচ্ছে, একবার নেভাচ্ছে। সিগারেটটা ধরিয়েই ধাক্কা দিয়ে চেয়ারটা সরিয়ে বাইরে ছুটলো।
এই রবি, কোথায় যাচ্ছিস, এই.. .এই রবি। ততোক্ষণে সে চলে গেছে।
রবি, স্বপন আর আমি একই রুমে বহুদিন ধরে আছি বলে খুবই ভালো বন্ধু আমরা। স্বপন এলে ওকে রবির কথা বললাম।
ওকে তো এমন করতে দেখিনি কখনো। স্বপন টেবিল থেকে রবির রেখে যাওয়া বোতলটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, বোতলে কি রে?
আমিও এতোক্ষণ বোতলটার প্রতি আমল দিইনি। কাছে গেলাম। মাঝারি আকারের নীলচে কাচের বোতল ভেদ করে স্বচ্ছ তরল দেখা যাচ্ছে। ভাবলাম মদ–টদ কিছু একটা হবে। স্বপন বোতলের ছিপিটা

খুলতেই কেমন একটা ঝাঝালো গন্ধ এলো, মনে হলো, শ্বাস আটকে যাচ্ছে। সরে এলাম বোতলটার কাছ থেকে।

স্বপন বললো, এসিড। কি যেন নাম বললো এসিডটার ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এসিড? এসিড দিয়ে রবি কি করবে?

এ এসিড দিয়েই যে কোনো মানুষকে ঝলসে দেয়া যায় মুহূর্তে।

স্বপন কেমিস্ট্রর ছাত্র। তাই সে বুঝতে পেরেছে। এতোক্ষণে আমিও বুঝলাম, রবি কেন বলেছিল নীলার রূপের অহংকার শেষ করে দেবে। হয়তো বা ভুল করে অথবা আমরা ধরবো না ভেবেই বোতলটা রেখে গেছে।

বহুদিনের প্রেম নীলা ও রবির। দুজন দুজনকে খুবই ভালোবাসে। খুব গভীর তাদের সম্পর্ক। ওদের দেখলে আর রোমিও–জুলিয়েট দেখতে হয় না। ওদের দেখে আমারও মাঝে মধ্যে গভীরভাবে ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়েছে কাউকে। গভীর ভালোবাসাই ছিল ওদের দুজনের! হঠাৎ কি এমন হলো যে নীলাকে এসিড মারতে হবে।

স্বপনকে বললাম, রবি, নিশ্চয়ই নীলাকে এই এসিডে ঝলসে দেবে। কি করা যায় বল তো।

চল এসিড ফেলে দিই।

এসিড ফেলে দিলেও কোনো লাভ হবে না। ও আবার এসিড যোগাড় করবে। রবিকে খুব ভালো করেই চিনি। কেউ ওকে ফেরাতে পারবে না। ও যা বলে তা করেই ছাড়ে। নীলাকে বলেও কোনো লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। নীলা কিছুদিন হয়তো সাবধান থাকবে। পরে রবি ঠিকই কাজ উদ্ধার করে ছাড়বে।

ভাবতে ভাবতে বুদ্ধি পেয়ে গেলাম। এসিডটুকু ফেলে দিয়ে বোতলটা ভালো করে ধুয়ে একই পরিমাণ পানি ভরে রেখে দিলাম ঠিক রবি যেখানে রেখেছিল সেখানে। রবি নিশ্চয়ই এসিডটা ব্যবহারের আগে আর বোতলের ছিপি খুলবে না। সুতরাং সে বুঝতেও পারবে না যে, বোতলের এসিড পানি হয়ে গেছে। এবার শুধু ও টের না পেলে হয়। ওই দিন রাতে রবি কখন রুমে ফিরেছিল জানি না।

পরদিন ক্যান্টিনে নীলাকে নিয়ে ওর বন্ধুরা হাসাহাসি করছে। কেউ একজন ঘুমের মধ্যে জানালা দিয়ে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে, এই শীতের রাতে। ওরা ভাবছে শীতের রাতে পানি ছিটিয়ে নীলার সঙ্গে কেউ মজা করেছে।

মনে মনে বললাম, আজকের কাগজেই তুমি হেডলাইন হয়ে যেতে পারতে নীলা। পরে অবশ্য রবিকে বোঝাতে পেরেছিলাম কি জঘন্য একটা কাজ করতে যাচ্ছিল সে।

রবির সঙ্গে নীলার কি হয়েছিল জানি না। তবে আমার ধারণা, যতোগুলো এসিড হামলা হয়েছে তার অনেকগুলো এই ভালোবাসাকে ঘিরে। যদি ভালোবাসার পরিণতি হিসেবে একটি মেয়েকে ধর্ষিতা হতে হয়, ঝলসে যেতে হয় এসিডে এবং কোনো ছেলেকে ড্রাগস নিয়ে নিঃশেষ হতে হয় তাহলে কি তাকে ভালোবাসা বলা যায়? তারচেয়ে ভালোবাসা শব্দের অর্থটা পাল্টিয়ে নিলেই তো হয়!

এই *ভালোবাসা দিবসে* সব ছেলেরা আসুন না প্রতীজ্ঞা করি, কোনো মেয়েকে এসিড মেরে কাপুরুষতার পরিচয় দেবো না। আর মেয়েরা প্রেম–ভালোবাসা নিয়ে খেলবেন না, প্লিজ।

ভালোবাসা দিবস থেকেই শুরু হোক না শুধু ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা।

ওই রাত

– ঝর্না

১৯৭৭ সালের ঘটনা। তখন আমি সবেমাত্র বিধবা হয়ে মায়ের বাড়িতে। মায়ের বাড়ি বলছি এ জন্য যে, বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে অন্যত্র থাকেন। তখন আমার বয়স ষোল–সতেরো বছর এবং কোলে সাত মাসের কন্যা সন্তান। বাপ–দাদার অবস্থা এক কালে ভালো থাকলেও বর্তমানে পদ্মার ভাঙ্গনে তা প্রায় সমস্ত নদী গর্ভে। মা তার অবস্থাপন্ন আত্মীয় বাড়িতে কাজ করে নাবালক চার পুত্র–কন্যাকে একবেলা খেয়ে, দুইবেলা না খেয়ে সংসার চালান। তার উপর বাড়তি ঝামেলা আমি এবং আমার মেয়ে। আমিও মায়ের সঙ্গে গিয়ে কাজ করে জীবন চালাই।

একদিন শুনলাম আমার অবস্থাপন্ন খালাতো ভাইয়ের বিয়ে। নিরানন্দ জীবনে একটু আনন্দের আভাস পেলাম। অনেক আত্মীয়, খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা হবে। দিন গুণতে গুণতে সত্যিই একদিন সেই আনন্দের দিন এসে গেল। পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গণ্ডগ্রাম ভরে উঠলো আনন্দ বন্যায়। আমার খালাতো ভাইয়ের হলুদ মাখানো অনুষ্ঠান হচ্ছে বিরাট উঠানে। আগত অতিথিরা ভাইয়ের গায়ে হলুদ মাখিয়ে কোলে আশির্বাদের টাকা রেখে চলে যাচ্ছেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করছিলেন বগুড়া থেকে আসা ফুপাতো বোনদের পাশের বাড়ির এক সুদর্শন যুবক।

অনুষ্ঠানটির প্রায় শেষ পর্যায়ে যুবকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি হলুদ দেবেন না?

বললাম, আমি বিধবা, কারো গায়ে হলুদ মাখানো আমাদের জন্য সমাজে বারণ।

যুবকটি বললো, এটা কুসংস্কার, এ নিয়ম মানা ঠিক নয়।

যুবকটিকে খুটিয়ে দেখছিলাম। মনে হয়েছে এমন একজন সুপুরুষকে প্রতিটি নারীই কামনা করে। গায়ে হলুদ দেয়া অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে শুরু হলো রঙ খেলা। ছেলে–বুড়ো, যুবক–যুবতী সকলেই মেতে উঠেছেন রঙ খেলায়। আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না।

ভুলে গেলাম আমি বিধবা। রঙ হাতে নিয়ে সোজা সেই যুবকের গাল রাঙিয়ে দিলাম। ঘটনার আকস্মিতায় হকচকিয়ে গেলেও এক পর্যায়ে আমাকে রঙ মাখাতে পিছু ধাওয়া করলো। আমি গিয়ে লুকালাম ধান রাখা গোলা ঘরে। এক সময় আমাকে খুজে পেয়ে জাপটে ধরে রঙ মাখালো।

গোলা ঘরে দুজনে জাপটে ধরে কতোক্ষণ ছিলাম মনে নেই। যখন খেয়াল হলো আমরা একে অন্যকে জাপটে ধরে আছি তখন তাকে বললাম, ছেড়ে দিন, কেউ দেখে ফেলবে। রাতে অনুষ্ঠান শেষে আমাদের বাড়ি আসবেন। কথা হবে।

রাতে সত্যিই দেখলাম আমার ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে থাকার অছিলায় আমাদের বাড়িতে এসেছে। মনে মনে আতকে উঠলাম। ভদ্রলোক থাকবেন কোথায়? আমাদের তেমন লেপ–কাথা নেই, তার ওপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, বেড়ার ফাকা দিয়ে শির শির করে বাতাস ঢোকে। একটি মাত্র ঘর যার একটি চৌকি। ভাই থাকে চৌকিতে আর আমি, আমার মেয়েসহ বাকি সবাই মেঝেতে।

স্থির হলো ভদ্রলোক আমার ভাইয়ের সঙ্গে চৌকিতে থাকবেন। আর আমরা মেঝেতে। হুজুগে চলে এলেও রাতে প্রচণ্ড শীতে কাপছিলেন ভদ্রলোক। বিয়ে বাড়ির প্রচণ্ড খাটা-খাটুনিতে পরিশ্রান্ত মা, ভাইসহ অন্যরা ঘুমিয়ে গেলেও আমার ঘুম আসছিল না। কারণ ভদ্রলোকের কাপনি এমন পর্যায়ে, যে কোনো দুর্ঘটনা অসম্ভব নয়। ইশারায় তাকে চৌকি থেকে নিচে আসতে বলি। ভদ্রলোক মনে হয় ওই ইশারার অপেক্ষায় ছিলেন। খুব সাবধানে চলে এলেন। আমি তাকে আমার বুকের মধ্যে জাপটে ধরলাম। ভদ্রলোকটি আমার বুকে মুখ-নাক ঘসে গরম হতে চাইলেন। আমরা আরো ঘনিষ্ঠ হলাম। ভোর রাত পর্যন্ত জড়াজড়ি করে কাটিয়ে দিলাম।

বিধবা জীবনে ওই রাতের ভালোবাসার কথা আজ দীর্ঘ দিন বুকে লালন করে আছি। জানি না সেই ভদ্রলোকটি আজ কোথায় আছেন, কেমন আছেন। আমি বর্তমানে গার্মেন্টসে চাকরি হারিয়ে এ বাড়ি, ও বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সুজানগর, পাবনা থেকে

পুলিশের মেয়ে

– শামীম

ছোটবেলা থেকে আমার বড় ভাইয়ের কাছে থাকি। যখন সময় পাই তখন দেশের বাড়িতে বেড়াতে আসি। এখানের খুব কম মানুষ আমাকে চেনে। তাই ছোটবেলার এক বন্ধুর সঙ্গে বেশি বেশি সময় কাটে। বন্ধুর বাড়ির এক অনুষ্ঠানে বসে ভিসিডি দেখছি এমন সময় একটি মেয়ে ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বসে আবার চলে গেল।

সিনেমা দেখা শেষে বললাম, মেয়েটি কে?

বললো, ছবির বান্ধবী। নাম নূপুর। বাবা পুলিশের চাকরি করে। এই অনুষ্ঠানেই নুপূরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তারপর আস্তে আস্তে ভালোলাগা থেকে ভালোবাসা। আমি যে রকম তাকে ভালোবাসি সেও আমাকে খুব ভালোবাসে। তার সঙ্গে প্রায় সব সময় দেখা হতো, কথা হতো। কিন্তু দুজনের এই সম্পর্ক বেশি দিন গোপন থাকলো না।

একদিন বিকেলে নূপুরের বাবা আমাকে তাদের বাসায় ডেকে নিয়ে গেল। আমার শরীর ভয়ে কাপছিল। তারপরও মনে সাহস নিয়ে তার সামনে বসে আছি। এমন সময় তিনি রক্তমাখা বড় বড় চোখে তাকিয়ে বললো, নূপুরের সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক? এখনো সময় আছে তার কাছ থেকে সরে যাও, না হলে পরে এমন অবস্থা করবো যে, মেরুদণ্ড খাড়া করে দাড়াতে পারবে না।

এরপরও নূপুরকে ভুলতে পারিনি, সে মাঝে মাঝে পালিয়ে দেখা করতে আসতো। কয়েকদিন পর বিকেলে হোটেলে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় একটি ছেলে আমাকে বললো, আপনাকে কাল সকালে নূপুরআপা ওই রাস্তার মোড়ে দেখা করতে বলেছে।

পরের দিন সকালে ওই রাস্তার মোড়ে পৌছালাম। এমন সময় আমার পেছন দিক থেকে আসা তিনজন পুলিশ জিজ্ঞাসা করলো, আমি কেন এখানে দাড়িয়ে আছি, কার জন্য দাড়িয়ে, আরোও অনেক অনেক প্রশ্ন।

অনেক অজুহাত দেখালাম, অনেক কিছু বললাম। তারা কিছু শুনলো না, আমাকে নিয়ে এলো থানায়। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বললেন, পুলিশের মেয়ের সঙ্গে পিরিতের সাধ তোর আজ মিটিয়ে দেবো। বলেই পুলিশেরা যা করে তাই শুরু করলো। আমার কোনো কথা শুনলো না, বাড়ির লোকজনের চেষ্টাতেও কাজ হলো না। পাঠিয়ে দিলো উচু লাল প্রাচীরে ঘেরা শ্বশুরবাড়ি।

এক চাচা বললেন, তুই নাকি কোনো পুলিশের মেয়েকে বাড়ি থেকে বের হতে দিস না, রাস্তা-ঘাটে ঝামেলা করিস। তার জন্য ওই পুলিশ তোর বিরুদ্ধে কেস করেছে।

এখানে চার দেয়ালের মধ্যে আমার সব কিছু অপরিচিত। কিছুই ভালো লাগে না, শুধু বাড়ির কথা মনে পরে। বেশ কয়েকদিন পর একটা স্লিপ পেয়ে দেখার ঘরে গেলাম। বোরখা পরা একটি মেয়ে আমার নাম ধরে ডাকতেই দেখি নূপুর।

কাটা ঘায়ে লবণ দিতে এসেছো নূপুর? এখানে তোমাকে কেউ দেখলে আমার বিপদ আরো বেশি হবে। তুমি তো জানো, কার জন্য এখানে এসেছি। তোমাকে ভালোবাসা আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ।

আমার কথাগুলো শুনে নূপুর একটি কথাও বললো না। শুধু দেখলাম তার দুই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পানি পড়ছে। যাবার সময় বললো, আমি এসবের কিছুই জানি না। তুমি এভাবে আমাকে দোষ দিও না। তুমি ভালো থেকো, আসি।

এখানে কিভাবে মানুষ ভালো থাকে তা আমার জানা নেই। তারপরও থাকতে হবে।

দিন গুণতে গুণতে দীর্ঘ দুই মাস সতেরো দিন পর পৃথিবীর মুক্ত আলো-বাতাসে ফিরে এলাম।

এখন আমার গ্রামের বাড়ি যাওয়া বন্ধ। কাজের অবসরে পড়ার টেবিলে নুপূরের কথা প্রচণ্ড রকম মনে পড়লেও তাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করি। কারণ তার পুলিশ বাবাকে আমি এখনো ভয় করি।

জয়পুরহাট থেকে

বন্ধুত্ব

– ইফতেখার হোসাইন রুমেল

ভালোবাসার সঠিক সংজ্ঞা বোধ করি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, গ্যেটে, শেক্সপিয়ার, নিউটন, আইনস্টাইন, শাহরুখ, টম ক্রুজ, জেমস, আজিজ মোহাম্মদ ভাই, এরশাদ এরা কেউই দিতে পারবেন না। কিন্তু স্ব স্ব অবস্থানে থেকে এরা নিশ্চয়ই প্রেম ভালোবাসায় মত্ত ছিলেন। কেউ ভালোবেসেছেন বিজ্ঞান সাধনাকে, কেউ বা সাহিত্যকে আবার কেউ রক্ত-মাংসে গড়া মানবীকে। যেভাবেই হোক, এদের সবার জীবনেই হয়তো প্রেম এসেছে।

বিশেষ করে শেষোক্ত দুজনের জীবনে প্রেম এক দুইবার নয়, বার বার এসেছে। তার মধ্যে এরশাদ মেরীকে মেরি করে, রওশনের জীবনে রোশনাই ছড়িয়ে, বিদিশায় এসে দিশা হারিয়ে ফেলেছেন। আজিজ মোহাম্মদ ভাইকে নিয়ে অনূর্ধ সাতশ শব্দের মধ্যে লেখা সম্ভব নয়। আর জেমস তো কিছুদিন আগে ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে বেনজিরকে নিয়ে এক নজিরবিহীন কাণ্ড ঘটালেন।

এসবই হয়তো ভালোবাসার উগ্র, শুষ্ক, শীতল বা উত্তাল বহিঃপ্রকাশ। তবুও কেন যেন মনে হয় এরা কেউই ভালোবাসার প্রকৃত সংজ্ঞা জানেন না। ভালোবাসা মানে কি এটা বোঝাতে কবি রফিক আজাদ তার কবিতায় আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তবুও এই অধমের তা বোধগম্য হয়নি।

আমার এই লেখাটা হয়তো যাযাদির অন্যান্য লেখক, পাঠকদের মতো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে ভাষার মাধুর্য, শব্দশৈলীতে ভরপুর। সর্বোপরি ছাপার যোগ্য নিপুণ কোনো রচনা নয়। তবে ভালোবাসা নিয়ে বিস্তর কাটাছেড়া করেছি। তাই এটা একটু ভিন্নমাত্রার লেখা।

১৪ ফেব্রুয়ারি স্বাভাবিকভাবেই প্রেমিক–প্রেমিকাদের জন্য একটি অন্য রকম আনন্দের দিন। কিন্তু *ভালোবাসা দিবস* এই নামের সঙ্গে দিনটার বৈশিষ্টগত তেমন মিল খুজে পাই না। আমার কাছে ভালোবাসা ব্যাপারটা বি–শা–ল। কেবল আমি আর তুমি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ কিছু নয়। তাই আমিও সুনীল গাঙ্গুলীর মতো বলি, *ভালোবাসা, প্রেম নয়!* অথবা *প্রেম, ভালোবাসা নয়!*

প্রকৃতি প্রেম, দেশপ্রেম, অনন্তপ্রেম, আমার প্রেম, তোমার প্রেম এই ধরনের কিছু কথা প্রচলিত আছে বাংলা ভাষায়। আমার মনে হয় এসবই ভালোবাসার অংশ বিশেষ। দিকবিশেষ নামান্তর মাত্র। আমার এসব ফিলোসফি কপচানো বোধহয় পাঠকের খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না। সম্ভবত নিজের কোনো প্রেমিকা না থাকায় প্রেমহীন ভ্যালেনটাইনস ডেগুলো কেটে যাওয়ায় আমার এই মস্তিষ্ক বিকৃতি। এক্ষেত্রে পাঠকের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

ভালোবাসার নামে আমরা প্রায়ই যা করে থাকি তা কখনো কর্তব্য, দয়া বা করুণা, মোহ, অভিনয় কিংবা ভান। সত্যিকারের ভালোবাসা পৃথিবীতে বিরল। তবুও ভালোবাসা আছে, থাকতেই হবে। না হলে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে মানুষ নামে জীবের বসবাস একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাড়াতো। দুর্লভ এবং একই সঙ্গে সুলভ এই ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে মায়ের বুকে, প্রিয়ার চোখে, ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে নিজ হাতে তুলে দেয়া অন্নতে, শীতার্ত বৃদ্ধার জ্বরাক্রান্ত দেহে পরিয়ে দেয়া চাদরে, কখনো বা বইয়ের পাতায়। কখনো মিশে থাকে প্রকৃতি আর দেশকে জড়িয়ে। ভালোবাসা আছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসে, ভালোবাসা আছে বিরহীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে।

এবার আসি অন্য প্রসঙ্গে। কোথায় যেন পড়েছিলাম –

যদি একটি পয়সা জোটে
তবে খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
যদি আরেকটি জোটে
তবে ফুল কিনিও হে অনুরাগী।

এই লেখাটা যারা পড়বেন সেই সব প্রেমিক–প্রেমিকার প্রতি আমার একটা অনুরোধ (অনধিকার চর্চা) আছে। তা হলো, ফুল কেনার জন্য একটি পয়সা খরচ করার আগে একজন ক্ষুধার্তের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তারা যেন একটি পয়সা খরচ করেন। জীবনের অসংখ্য অপচয়, অপব্যয়ের খাতায় না হয়

আরো কিছু যুক্ত হলো। তবে সত্যি সত্যি এ রকমটা ঘটলে ১৪ ফেব্রুয়ারির এই ভ্যালেনটাইনস ডে কিছু কিছু মানুষের জন্য হয়ে উঠবে ভালোবাসার দুর্লভ সাধের দিন। আর এটা হবে প্রকৃত ভালোবাসার সুন্দরতম বহিঃপ্রকাশ। প্রেমিকার মুখের হাসি কি ক্ষুধা নিবৃত্তির পর নিয়ত অনাহারি শিশুটির তৃপ্তি মিশ্রিত হাসিটির চেয়েও মধুর? কে জানে! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমাদের এই বাংলাদেশে ক্ষুধার্ত শিশু বেশ সহজলভ্য।

অবশেষে আরেকটা ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা লিখে আমার লেখাটা শেষ করবো। আমি এমনিতে বন্ধুবৎসল। শুধু একটা বিষয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমার মনের মিল হয় না। যখন আমার বন্ধুরা *প্রেমে* পড়ে তখন নিশ্চুপ থাকি, যখন প্রেম করতে শুরু করে তখন বাধা দিই, যখন প্রেমে মরিচা ধরে তখন চেষ্টা করি কেরোসিন দিয়ে ঘষেমেজে তা চালু রাখার। এবং অবশেষে যখন বন্ধুরা *সম্পর্ক* ছিন্ন করে তখন বাধ্য হয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করি।

এতোটুকু ভূমিকার পর যে কথাটা বলতে চাই তা হলো, যারা প্রেম করছেন বা ভবিষ্যতে করবেন তারা যেন সত্যিকারের প্রেম করেন। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণটা যদি অদৃশ্য হয় তাহলে প্রেম না করে বন্ধুত্ব করে ফেলুন। বন্ধুকে সব সময়ই ভালোবাসা যায়। কিন্তু প্রেমিক বা প্রেমিকা সব সময় বন্ধু হয়ে উঠতে পারে না। তাই আমার কাছে প্রেমের চেয়েও বন্ধুত্ব মধুর। মতান্তর অবশ্য থাকবেই।

সবাই ভালো থাকুন। ভালোবাসুন।

জাঙ্গালহাটা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট থেকে

ক্ষমাপ্রার্থী

– তাজিম মাসুদ

মা–বাবার অমতে বিয়ে করেছি তিন বছর হলো। দুই বছর যাবৎ প্রবাসী স্ত্রীর উষ্ণ আদর ও ভালোবাসার স্মৃতি বুকে নিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি প্রবাস জীবন। প্রিয় মানুষটি ছাড়া বছরকে যুগের চেয়েও দীর্ঘ মনে হয় একেকটি দিন। তারপরও কঠিন বাস্তবতা ভেবে প ার করছি কঠিন দিনগুলো। হঠাৎ এ বছরের ভ্যালেনটাইনস ডে সব কিছু ওলোট–পালোট করে দিল।

ভ্যালেনটাইনস ডে উপলক্ষে আমার কাছে স্ত্রীর বায়না ছিল আমার লাইফ সাইজের একটি ছবি। আমার শত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তুলে পাঠিয়েছি এবং শর্ত দিয়েছি ১৪ ফেব্রুয়ারির আগে প্যাকেট খুলবে না। সে শর্ত মতো প্যাকেট না খুলে ১৪ তারিখের অপেক্ষা করছিল।

স্ত্রীর কাছে আমার বায়না ছিল শাড়ি পরা অনেকগুলো ছবি। আমার স্ত্রী নিয়মিত নামাজ, রোজা ও বোরকা পরে বিধায় প্রথমত ছবি তুলতে অস্বীকৃতি জানায় (বিরোধী দলীয় নেত্রী তালিবান ভাববেন না যেন)। আমি অনেক অনুরোধ করে বললাম, এবার ঈদেই প্রথম আমার টাকায় শাড়ি গহনা কিনেছো। আমি প্রবাসী বলে আমার বুঝি মন থাকতে নেই? এসব দেখতে ইচ্ছা করে না?

কথায় কাজ হলো। অগত্যা সে রাজি হলো। কথা মতো ক্যামেরা কেনা হলো জাপানিজ *ইয়াশিকা।*

ঈদের রাতে ফোনে মধ্য রাত পর্যন্ত কথা হলো। ধার করা কবিতা দিয়ে তাকে বললাম, তুমি আমার ইয়াশিকা চোখে, ফুজি ফিল্ম হৃদয়ে তোলা এক নিখুত ছবি। জানলাম, আজ ছয় সাতটা শাড়ি পরে ছবি তুলছে। কথার ফাকে সুযোগ বুঝে বললাম, সম্ভব হলে শাড়ি খুলে দুই একটা ছবি তুলো।

সে আদরের সুরে বললো অসভ্য কোথাকার!

বললাম, লজ্জা কিসের? তোমার সব কিছুই তো আমি দেখেছি। তুমি শুধু ছবি তুলে দেবে, আমি মহিলাদের স্টুডিও থেকে ওয়াশ করে নেবো। তুমি চিন্তা করো না। আমি ছাড়া অন্য কেউ তোমার ছবি দেখবে না।

কি যেন চিন্তা করলো কিছুক্ষণ। এরপর আমাকে কিছুটা আশ্বস্ত করে ফোন রেখে দিল।

ঈদের তিন দিন পর আবার ফোনে কথা হলো।

তার কথা শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। ফিল্মের বত্রিশটা ছবি তুলছে বিভিন্নভাবে। আমার অনুরোধ রাখতে গিয়ে দুইটি ছবি খুব খোলামেলাভাবে তুলেছে। তার স্কুলে পড়া ছোট বোন তুলে দিয়েছে ছবিগুলো। গতকাল বিকেলে ছবি তুলে ক্যামেরাটা খোলা জানালার পাশে টেবিলে রেখে বসে বসে কল্পনা করছিল, আমি ছবিগুলো দেখার পর তার লজ্জার কথা। হঠাৎ মাগরিবের আজান হওয়ায় ওজু করতে চলে গেল। নামাজ পড়ে এসে ক্যামেরাটা খুজে পাচ্ছে না। সারা রাত খুজে আর কেদে লাভ হয়নি। ফোনেও কান্না থামছে না। কান্না থামাতে চাইলে উল্টো ফল হচ্ছে। কি বলে সান্ত্বনা দেবো ভেবে পাচ্ছি না। নিজেকে অপরাধী মনে হলো। আমার জন্যই তার এ অবস্থা। শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলে জানলাম, কান্না করে করে রাতে দুইবার বেহুশ হয়েছিল। বার বার বলছে, আমার ছবিগুলো অন্য লোকজন দেখলে কি অবস্থা হবে?

যে স্ত্রীর হাসি কেনার জন্য আজ আমি সাড়ে ছয় হাজার মাইল দূরে নিঃসঙ্গ প্রবাস জীবন কাটাচ্ছি, নিজের অজান্তে সেই স্ত্রীকে কান্না উপহার দিলাম। তাই ভ্যালেনটাইনস ডে সবার জন্য খুশির হলেও আমার জন্য বয়ে এনেছে নীল কষ্ট।

বৌ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আর কোনোদিন তোমার এ রকম ছবি দেখতে চাইবো না। আমি তোমার হাসি শুনতে চাই, কান্না নয়।

দক্ষিণ কোরিয়া থেকে

অনুক্ত

–আছমা বেগম হাছিনা

আমার চাচাতো ভাই মিডল ইস্টে ছিলেন। তিনি তার ক্বফিলকে ধরে ও টাকা খরচ করে গ্রেট বৃটেন এসেছিলেন। ওনাকে আমাদের বাসায় এনে আব্বা রেখেছিলেন। তারপর আইরিশ একটি মেয়েকে দিয়ে কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ করিয়েছিলেন। শর্ত ছিল, মেয়েটি ভাইয়াকে আইরিশ লিগ্যাল করে দেবে। বিনিময়ে ভাইয়া ওই মেয়েটির হাতে অর্থ ধরিয়ে দেবেন।

ভাইয়া জানেন না, সেই ছোটবেলা থেকেই আমি ওনাকে পছন্দ করি। তিনি যখন দেশে ছিলেন তখন আমার চাচাতো বোন এবং ওনার সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা হতো। দেশে গেলে ওনার সঙ্গে আমাদের গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যেতাম। ভাইয়া খুব সুন্দর করে গল্প করতে পারেন। আমি মুগ্ধ হয়ে ওনার গল্প শুনি। ওনার গল্প করা ভঙ্গি দেখে ওনার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম।

ইংল্যান্ড–এর নাইটসবৃজ এলাকায় *হ্যারডস* নামের দোকানটি অবস্থিত। বিখ্যাত দোকান। এ দোকানে বেশির ভাগ সময় সেলিব্রেটিরা আসেন। এ দোকানের জিনিসপত্রের দাম বড্ড চড়া। যেমন ধরা যাক, টফি যদি অন্য দোকানে দুই পাউন্ড হয় তাহলে হ্যারডস–এ হবে পাচ পাউন্ড।

আমার ছোট ভাই আমিনুল একদিন হ্যারডস–এ গিয়েছিল। তারপর কি যেন এনেছিল, সঙ্গে হ্যারডস–এর শপিং ব্যাগ এনেছিল। সেই থেকে দুই একদিন পর পর অন্য দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র কিনে হ্যারডস–এর ব্যাগে করে বাসায় আনতো যাতে সবাই বুঝতে পারে সে হ্যারডস থেকে কিনে এসেছে। সে বলতো, এতে নাকি তার বন্ধু মহলে তার প্রেস্টিজ বেড়ে যাবে।

আমি একদিন ভাইয়াকে বলেছিলাম তিনি যেন আমাকে হ্যারডস–এ নিয়ে যান। আমি জানি বৃটেনে এসে ওনার কন্ট্রাক্ট ম্যারেজের টাকা আব্বার কাছ থেকে নিয়েছিলেন ধার হিসেবে।

সপ্তাহে সপ্তাহে অনেক কষ্ট করে সে ঋণ পরিশোধ করছেন। ভাইয়া কৃপণের মতো খরচ করে টাকা জমাচ্ছেন, খুব কষ্ট করছেন। হ্যারডসে নিয়ে গিয়ে ওনার টাকা খরচ করাবো না। খরচের জন্য আমি টাকা এনেছি। আমি বৃটিশ নাগরিক। আমার জন্ম কার্ডিফ–এর একটি হাসপাতালে হয়েছে। সে জন্য আমার ফ্যামিলিতে ভালো অবস্থান নিয়ে আছি।

আমরা কার্ডিফ থেকে রওনা হয়েছিলাম। এখান থেকে নাইটসবৃজ যেতে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগে যায়। ভাইয়ার বন্ধু গাড়ি চালাচ্ছেন, ট্যাকসিতে অনেক টাকা লাগবে। তাই ভাইয়া ওনার বন্ধুকে বলে গাড়ি এনেছেন। সঙ্গে ওনার বন্ধুকেও এনেছেন।

ভাইয়ার কাছ থেকে কুয়েত–এর কথা শুনলাম। সেখানে অনেক কষ্টে বাংলাদেশি শ্রমিকরা দিন যাপন করছে। অনেক বিএ, এমএ পাস ছেলেরাও নাকি ক্লিনিং কম্পানির ভিসা নিয়ে কুয়েতে গিয়ে সেখানকার রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে।

হ্যারডসে গিয়ে পৌছার পর দেখা গেল সেখানে অনেক পুলিশ রয়েছে। জানা গেল, মাইকেল জ্যাকসন কনসার্টে লন্ডন এসেছিলেন এবং শপিং করার জন্য তিনি হ্যারডসে এসেছেন। সিকিউরিটির জন্য সব কাস্টমারকে সরিয়ে শুধু ওনাকে ভেতরে রাখা হয়েছে। তিনি চলে গেলে অন্য কাস্টমারকে ঢুকতে দেয়া হবে।

ভাইয়ার বন্ধু ও আমাকে নিয়ে ভাইয়া একটি কফি শপে ঢুকলেন। ভাইয়া বললেন, এই হ্যারডস–এর মালিক মোহাম্মদ আল ফায়েদ। ওনার দেশ ইজিপ্ট। ওনার ছেলের নাম ডোডি আল ফায়েদ। ডোডির সঙ্গে বৃটিশ রাজবধূ ডায়ানা–র ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। বৃটিশরা ধূর্ত জাত। তারা দেখলো ডায়ানার সন্তান হ্যারি ও উইলিয়াম আছে। এখন যদি ডায়ানার গর্ভে ডোডি আল ফায়েদ–এর কোনো সন্তান আসে তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে। ডায়ানা যদি মুসলমান ডোডি আল ফায়েদ–কে ভালো না বেসে কৃশ্চিয়ান ধর্মের যে কাউকে ভালোবাসতো তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না। তারা তা মেনে নিতো। ডোডির কোনো সন্তান যদি ডায়ানার গর্ভে জন্ম হয় তাহলে রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী

হিসেবে মুসলমান রক্ত এসে যাবে। সমস্যা হয়ে যাবে। তাই ডায়ানা ও ডোডির গাড়িকে অ্যাকসিডেন্ট করানো হলো। তাদের ভালোবাসার কাহিনী কভারআপ করার জন্য অন্য গল্প চালিয়ে দেয়া হলো। এখন পর্যন্ত ডায়ানা ও ডোডি-র কিলার-এর নাম পাওয়া যায়নি। অথচ বৃটিশের ডিটেকটিভরা ঘাস খেয়ে বাচে না।

ভাইয়ার এ কথা শুনে মনে মনে বলেছিলাম, ভাইয়া, তারা দুজন দুই ধর্মের ছিলেন। কিন্তু আমরা তো একই ধর্মের মানুষ। আমাদের কি মিলন হবে না?

ভাইয়াকে আজ পর্যন্ত আমার ভালোলাগার কথা জানাতে পারিনি।

কার্ডিফ, ওয়েলস থেকে

মানসী

– মোহাম্মদ বজলার রহমান

আজ এতো বছর পর আমার শেষ বয়সে যার কথা লিখছি তাকে প্রথম কবে ভালোবেসেছিলাম তা আজ আমার মনে নেই। হয়তো বা একটু একটু করে হৃদয় মাঝে তার প্রতি ভালোবাসা জমে উঠেছিল বলেই বলতে পারি না প্রথম কবে তাকে ভালোবেসেছিলাম।

আমার তখন বয়স বিশ একুশ। একটা স্কুলে চাকরি পেলাম। মেয়েদের হাই স্কুল। আমার গ্রামেই।

নিয়োগ দেয়ার সময় ম্যানেজিং কমিটির লোকেরা বললেন, আমাদের মুখ রাখবে তো!

আমি ছাত্র হিসেবে ভালো ছিলাম। স্বভাব, চরিত্রও ভালো। তাই ব্যাচেলর হওয়া সত্ত্বেও আমার পরিবারের চরম আর্থিক অনটনের সময় পেয়ে গেলাম মেয়েদের স্কুলের চাকরিটা। স্কুলের কর্তৃপক্ষকে পুরোপুরি আশ্বাস দিলাম এমন কাজ কোনোদিনই করবো না যাতে আমাদের লজ্জায় পড়তে হয় অথবা লোকে ছিঃ ছিঃ করে।

আমার নিয়োগের দুই মাস পরে একজন মেয়ে শিক্ষিকা নিয়োগ দেন কর্তৃপক্ষ। আমার পূর্ব পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও এড়িয়ে চলি তাকে।

আমার পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আমার মুখোমুখি হলো সে। আমাকে চার্জ করে বসলো। বললো, আমি বাঘ না ভাল্লুক, আমাকে এতো ভয় কিসের? কথা বলছো না কেন? নাকি আমাকে চিনতেই পারছো না! তুমি কি অতীত সবটাই ভুলে গেছো নাকি ভুলে যাবার মিথ্যা অভিনয় করছো? যদি ভুলে গিয়ে না থাকো তাহলে বলো, আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমার সঙ্গে কথা বলছো না। কিছু না বলেই সরে পড়লাম। দুই তিন মাস তেমন আর কোনো কথাই হলো না। হঠাৎ আবার একদিন আমার মুখোমুখি হয়ে একখানা ছোট চিরকুট আমার হাতে ধরিয়ে দিল। আমার হৃৎপিণ্ডের গতি গেল বেড়ে। কারণ আমি তো নিজে জানি এই মেয়েকে কতো ভালোবাসি। আমি নিজের দেহের একটি অংশের চেয়েও তাকে বেশি ভালোবাসি। বাড়ি গিয়ে চিঠিটা খুলে পড়লাম।

লিখেছে, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো আর না বলো আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে আমরা যখন ক্লাস থ্রি-তে পড়তাম তখনই আমার হৃদয়ের সিংহাসনে তোমাকে সম্রাট বানিয়েছি। ওখান থেকে হাজার চেষ্টা করলেও তুমি নামাতে পারবে না। তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে রেখেছি।

চিঠিখানা বার বার পড়লাম। কিন্তু তখনই আমার মনে হলো, আমি সবাইকে কথা দিয়েছি, কিভাবে আমার শপথ ভাঙি? আমি তো কোনোদিনই আমার অঙ্গীকার থেকে সরে দাড়াইনি আমার জীবনে। পরদিন থেকে নিজেকে আরো গুটিয়ে নিলাম। তার দেয়া চিঠিটা তাকে ফেরত দিলাম।

খুব রাগ করলো আমার স্বপ্নের রানী, আমার মানসী। ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার সময় সামান্য একটা ঘটনা আমাদের পরস্পরকে কাছে আসতে সাহায্য করে। এটাকে বাল্যপ্রেম বলা যেতে পারে। কিন্তু জীবনের বয়স যতোই বেড়েছে ততোই আমরাও পরস্পরকে আপন করে ফেলেছি। আমার পরিবারের সঙ্গে তার পরিবারের আর্থিক ফারাকটা বেশি। সে ধনী এবং আমি গরিব পরিবারের ছেলে। আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসাটাও আস্তে আস্তে অন্য রকম হয়ে গেছে। তাকে ভালোবাসি একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসেবে। আমার স্বপ্নের রানী, আমার মানসী সব সময় আমার অনুপ্রেরণার উৎস। আমার মানসীর ভাবনা অন্য। সে আমাকে পেতে চায় স্বামী হিসেবে।

সে লিখে জানালো, একজন মেয়ে একজন ছেলের শুধুই প্রেমিকা। অন্য কোনো সম্পর্ক নিয়ে গভীর ভাবে ভালোবাসা যায় না। তুমি আমার প্রেমিক, আমার সারা জীবনের সঙ্গী, আমার সকল ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। তোমাকে ছাড়া আমি বাচবো না, বাচতে পারি না। আমার সারা অন্তর জুড়ে শুধুই তুমি।

আমি যতোই তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাই ততোই আমাকে সে নিবিড়ভাবে কাছে পেতে চায়। কাছে পেলেই আমাকে জড়িয়ে ধরে। আদরে আদরে আমাকে পাগল করে ফেলে। সুতরাং আমাদের বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেল।

আমার মানসীর দাদা এবং আম্মা আমাকে ডেকে মানসীর অসাক্ষাতে আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন কোনোদিন মানসীর দিকে হাত না বাড়াই।

আমি তাদের কথা দিলাম।

তারপর একদিন আমার মানসীর অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেল। খুব কষ্ট পেলাম। সারা রাত একা একা বসে কাদলাম। কিন্তু মানসীকে জানতে দিলাম না কোনো কিছুই। আজও মানসীর কোনো খোজ নিইনি। সারা অন্তর জুড়ে তার হাসিমাখা মুখখানা ভেসে আছে। সে মুখকে মলিন করতে চাই না। আমি তো তাকে খুশি এবং সুখী দেখতে চেয়েছি। নিশ্চয়ই সে সুখে আছে। সকল মানুষেরই তো উচিত যেন তার আপনজন সুখী হয় সেই কামনা করা। আমি নিশ্চয়ই ভুল করিনি।

আমার জীবন সায়াহ্নে যখন আমার প্রথম ভালোবাসার কথা ভাবছি তখনো আমার মনে কোনো অপরাধ বোধ নেই। কারণ আমি তোড়জোড় করে কিছু করতে চাইনি। আমি শুধুই ভালোবেসেছি।

পোরশা, নওগা থেকে

নিঃসঙ্গতা

– লাবণ্য

পাশের ফ্ল্যাটের সেই ছেলেটির নাম ছিল হৃদয়। তাদের বাসায় নতুন যখন গেলাম প্রথমে তার সঙ্গে কথা হয়নি। শুধু চুপি চুপি দুজন দুজনকে দেখতাম আর চোখে চোখ পড়লেই পালিয়ে আসতাম। হৃদয়ের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখলেও তার প্রতি আমার কৌতূহল কম ছিল না। যখন দেখতাম সে বাসায় নেই সেই ফাকে তার আম্মুর সঙ্গে গল্প করতে করতে তার পড়ার টেবিলে ছোটখাটো একটা তল্লাশি চালিয়ে ফেলতাম।

এমনিভাবে লুকোচুরি খেলতে খেলতে একদিন পরিচয় হলো। পরিচয় থেকে ভালোলাগা আর ভালোলাগা থেকেই ভালোবাসা। ২০০১ সালের ১ মার্চ বিকেলে সে আমায় বলেছিল, ভালোবাসি তোমায়। সেদিনের সেই বিকেলে তার কণ্ঠে ছিল মাধুর্য। দুই চোখে ছিল ব্যাকুলতা এবং বুকে ছিল ভালোবাসা পাবার সীমাহীন প্রতীক্ষা। শূন্য দুই হাত বাড়িয়ে বলেছিল, আমায় জীবনে সব কিছুর মূল্যে তোমাকে পেতে চাই। সেদিন তার ভালোবাসা ও চাওয়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলাম। তার শূন্য দুই হাতে হাত রেখে বলেছিলাম, আমিও ভালোবাসি তোমায়। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। কথা দিয়েছিলাম, দুজন দুজনকে ভালোবেসে যাবো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

এরপর শুরু হলো এক নতুন জীবনের সূচনা। যে জীবনে দুজন দুজনের ভালোলাগায় প্রাধান্য দিতাম। কথা হতো ইশারায়, চিঠি দেয়া–নেয়া হতো কাজের মেয়ের মাধ্যমে, কখনো বা ক্যাসেটের মধ্যে করে। মাঝে মধ্যে নির্দিষ্ট একটি ফাস্ট ফুডের দোকানে আমাদের দেখা হতো।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিল সময়। হৃদয় একদিন এক ভাবীর বাসায় বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করলো। স্বচ্ছন্দে রাজি হলাম।

ভাবীর বাসায় গিয়ে সবাই মিলে বসে এক ঘরে আড্ডা দিচ্ছিলাম। একটু পরে হৃদয় অন্য ঘরে চলে গেল। তখন ভাবীর ছোট্ট সোনামণির সঙ্গে খেলছিলাম।

হৃদয়ের বন্ধু আমাকে পাশের ঘরে যেতে বললো। বললো, হৃদয় আমাকে ডাকছে।

পাশের ঘরে যেতেই হৃদয় দরজা বন্ধ করে দিল এবং বললো, কেউ এসে পড়তে পারে। এরপরই শুরু হলো তার পাগলামি। প্রথমে সে আমার জামা খুললো, আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সে পাগলের মতো আমার শরীরে বিচরণ করতে লাগলো। আস্তে আস্তে সে আমার সালোয়ার খুলে ফেললো। আমার শরীরে এমন কোনো অংশ নেই যেখানে সে স্পর্শ করেনি। আমার সঙ্গে হৃদয় অনেক কিছু করলো। কিন্তু বহু কষ্টে সেদিন তার কাছ থেকে বাচিয়ে রেখেছিলাম একটি নারীর শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান সম্পদ আমার সতীত্ব। আমার সতীত্বের স্বাদ নিতে না পেরে হৃদয় আমায় খুব অপমান করেছিল। রাগে ও কষ্টে সেদিন ভাবীর বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। আর ভেবেছিলাম নারীরা কতো অসহায়।

এরপর থেকে হৃদয় বদলাতে শুরু করলো। আমার সঙ্গে দেখা করে না, টেলিফোনে কথা বলে না। দেখা করতে বললে বলে, আমি খুব ব্যস্ত। হঠাৎ করেই সেই চেনা হৃদয় যেন অচেনা হতে শুরু

করলো। একদিন দেখলাম আমার হৃদয় অন্য একটি মেয়ের হাতে হাত রেখে পথ চলছে। জানলাম মেয়েটির নাম অনামিকা। হয়তো এখন সে অনামিকার সঙ্গেও ভালোবাসার অভিনয় বা শরীর নিয়ে খেলার বাসনায় মেতে রয়েছে।

আজ আমি বড়ই নিঃস্ব। নিঃসঙ্গতা প্রতিনিয়ত আমাকে যন্ত্রণা দেয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফেলে আসা স্মৃতিগুলো। আমি এখন আর কারো হাতে হাত রাখি না। নিঃসঙ্গতাকে বন্ধু করে কষ্টগুলোকে বুকের মধ্যে চাপা দিয়ে জীবন কেটে যাচ্ছে কোনো রকমে যাকে বলে শুধু বাচার জন্য বেচে থাকা বা মরে গিয়ে বেচে থাকা।

উপশহর, রাজশাহী থেকে